Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয়


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া পারভীন

রোলঃ 227020523


৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া পারভীন

রোলঃ 227020523

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয় ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া পারভীন, আইডিঃ 227020523বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sumyia

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

**সুমাইয়া পারভীন**

আইডিঃ 227020523

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

**No table of contents entries found.**

**অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়**

দাওয়াতি কাজে মুসলিমদের অমনোযোগিতার সুযোগে অমুসলিমরা  কিভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানাভাবে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে এবং এই পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয়।

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ
بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾ وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَ اخْتَلَفُوْا
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۰۵﴾ۙ يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ
ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۱۰۶﴾وَ
اَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۷﴾

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে  দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে  স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াত সমূহ বয়ান করেন। যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট  স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ  আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে  কঠোর আযাব।সেদিন কিছু মুখ উজ্জল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে যাদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), ‘তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে। আর যাদের মুখ উজ্জল হবে তারা আল্লাহর অনুগ্রহে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। [ আলে ইমরান আয়াত: ১০৩-১০৭]

**ভূমিকা**

ইসলাম শান্তি, ন্যায় ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। এই ধর্ম মানবজাতির সকল স্তরের জন্য কল্যাণ ও উত্তম আচরণের আদর্শ স্থাপন করেছে। তবে যুগে যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা

চালানোর জন্য কিছু মানুষ, দল বা গোষ্ঠী সক্রিয় হয়েছে। অমুসলিমদের এই অপতৎপরতার পেছনে আছে ভুল ধারণা, বিদ্বেষ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ। এটি কখনো রাজনৈতিক, কখনো সাংস্কৃতিক, আবার কখনো ধর্মীয় বিরোধিতার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মুসলমানদের উচিত কুরআন ও হাদিসের আলোকে তাদের করণীয় নির্ধারণ করা। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দাও এবং অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১১০)। তাই অমুসলিমদের অপতৎপরতার জবাবে আমাদের আচরণ হতে হবে ইসলামের নীতি ও শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে।

বর্তমান সময়ে, পৃথিবীজুড়ে ধর্মীয় মিশনারি কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষত খ্রিস্টান মিশনারি সংগঠনগুলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহে তাদের ধর্মীয় প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। খ্রিস্টান মিশনারিরা নানা কৌশল গ্রহণ করে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রচার করছে এবং সমাজের নাজুক অবস্থায় থাকা জনগণের মধ্যে তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। এসব কার্যক্রম মূলত দাওয়াতি কাজে মুসলিমদের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যেখানে ইসলামী মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় ঐক্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

এ পরিস্থিতিতে, মুসলিম সমাজের জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব, বিশেষত দাওয়াত ও ইসলামী শিক্ষা প্রচারের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা। কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনায় এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে, যার মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় ঐক্য এবং পরিচিতি রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ তাআলা সুরা আলে ইমরান (৩:১০৩-১০৭) এ মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এমন এক সম্প্রদায় গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন, যারা ভালো কাজের প্রতি আহ্বান করবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং সত্যের পথে অবিচল থাকবে।

এই আয়াতগুলো মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করে, যেখানে তাদের ঐক্য, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। যখন মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়, তখন তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐক্যহীনতা জাতির দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

এই থিসিসের উদ্দেশ্য হলো, অমুসলিমদের  কার্যক্রমের বিভিন্ন কৌশল বিশ্লেষণ করা এবং মুসলিম সমাজকে কীভাবে তাদের বিশ্বাস রক্ষা করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা। আমাদের দাওয়াতি কার্যক্রম এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রচারের মাধ্যমে, মুসলিমদের একে অপরকে সহায়তা করতে হবে এবং বহিরাগত ধর্মীয় প্রভাবের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে হবে।

**বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারির অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়**

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের ইতিহাস অনেক পুরনো। তবে, বর্তমান যুগে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের বিস্তার এবং তা বাংলাদেশসহ মুসলিম দেশগুলোতে তাদের

প্রভাব বিস্তার একটি নতুন মাত্রা ধারণ করেছে। মুসলিম সমাজের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত সংগঠিতভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের প্রচারণার উদ্দেশ্য মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষয় ঘটানো ও ইসলামের মূল ভিত্তি ধ্বংস করা। বাংলাদেশ, যা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ, খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের প্রসার অনেকটাই বাড়ছে। মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো দেশে নানা ধরনের শাসন, শিক্ষা ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশেষত, খ্রিস্টান মিশনারিরা দেশের বিভিন্ন স্থানে শখ, স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ড এবং শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করছে। তাদের পরিকল্পনায় মুসলিম যুবসমাজের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে সন্দেহ এবং দ্বিধা সৃষ্টি করা প্রধান লক্ষ্য। তারা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামাজিক কর্মসূচি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহ তৈরি করার চেষ্টা করছে।খৃষ্টান মিশনারি সংস্থা বা মিশনারি হল এমন একটি সংগঠন যা খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে। সারা বিশ্বে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রচারক নিয়োগ দিয়ে তারা খৃষ্টধর্মের প্রচারে নিবেদিত। মিশনারি কার্যক্রমের লক্ষ্য কেবল ধর্মীয় দাওয়াত নয়, বরং সামাজিক সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খৃষ্টধর্মের প্রসার ঘটানো। বাংলাদেশে মিশনারি কার্যক্রমের শুরু প্রাচীন ইতিহাসে ফিরে যায়, যখন পর্তুগিজরা বাংলায় প্রবেশ করে এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারিদের নিয়ে আসে।

এছাড়া, বাংলাদেশের শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারি কাজের ধরন ও কৌশলও ভিন্ন। শহরাঞ্চলে তারা শীর্ষস্থানীয় স্কুল, হাসপাতাল এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি প্রমাণ করে, যেখানে গ্রামের অঞ্চলে তারা দরিদ্র জনগণের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী কাজ এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

**মিশনারির আগমন ও কার্যক্রম**

খৃষ্টান মিশনারি কার্যক্রম বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ প্রায় পাঁচশ থেকে ছয়শ বছর আগে। প্রথমদিকে, পর্তুগিজরা বাংলায় বাণিজ্য করতে আসার পর তাদের সাথে খৃষ্টান মিশনারিরাও আসে। ১৬০০ শতকের গোড়ার দিকে, পর্তুগিজরা বাংলার হুগলি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করে।

মোগল সম্রাট আকবরের আমলে ১৬০০ শতকের শেষভাগে, হুগলি অঞ্চলে পর্তুগিজ মিশনারিরা গির্জা, স্কুল এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। ১৬৩৩ সালে সম্রাট শাহজাহান খৃষ্টান মিশনারিদের জন্য ৭৭৭ বিঘা জমি দান করেন, যা তাদের কর্মকাণ্ডকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। পরবর্তীতে, মোগল আমলে অগস্টেইনিয়া এবং জেসুইট

মিশনারিরা বাংলার বিভিন্ন স্থানে মিশনারি কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এই সময়েই বাংলায় প্রথম মিশনারি গির্জাগুলি স্থাপিত হয়।

**ব্রিটিশ আমলে মিশনারি কার্যক্রমের প্রসার**

ব্রিটিশ শাসনামলে, বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের পর, মিশনারি কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ব্রিটিশ সরকার মিশনারি কার্যক্রমের পৃষ্ঠপোষকতা দেয় এবং চিকিৎসা, শিক্ষা ও দাতব্য কাজের মাধ্যমে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারিদের অধিক সুযোগ প্রদান করে। এই সময়েই বাংলায় ব্যাপকভাবে হাসপাতাল, স্কুল এবং কল্যাণমূলক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী এবং অন্যান্য অঞ্চলে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও, মিশনারি সংস্থাগুলি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সাহায্য করতে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দরিদ্রদের মধ্যে খৃষ্টধর্মের প্রচার করা। ব্রিটিশ আমলে ৯০টি প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারি কর্মরত ছিল, যারা সাধারণ মানুষকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে বিশেষভাবে কাজ করেছিল।

**পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশের পরবর্তী অবস্থা**

পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পরেও খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ১৯৭১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারি সংস্থাগুলির কার্যক্রম আরও বেড়ে যায়। এই সংস্থাগুলির মধ্যে কিছু যেমন "কারিতাস", "ওয়ার্ল্ড ভিশন", "লুথারান মিশন", "সালভেশন আর্মি", "সি.ডি.এস." ইত্যাদি সংস্থা খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে।

বর্তমানে এসব সংস্থাগুলি সাধারণত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, দরিদ্রতা বিমোচন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা প্রদান করতে থাকে। তারা বিভিন্ন সামাজিক সেবা প্রদানকারীর নামে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন এনজিও যেমন "সেভেন ডে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট", "চাইল্ড ফ্যামিলিজ" এবং "এডরা" এসব সংস্থা গরীব, অসহায় ও নিরক্ষর জনগণের জন্য কাজ করে থাকে এবং সেবা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় দীক্ষা প্রদান করে থাকে।

**মিশনারি কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও পন্থা**

বাংলাদেশে মিশনারি কার্যক্রমের উদ্দেশ্য মূলত খৃষ্টধর্মের দাওয়াত দেওয়া, তবে তারা সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করে এই দাওয়াত দেয়। তারা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও ঋণ সুবিধার মাধ্যমে গরীব ও অসহায় মানুষের মধ্যে খৃষ্টধর্মের প্রতিধ্বনি সৃষ্টির চেষ্টা করে।

বিশেষ করে, "কারিতাস" এবং "ওয়ার্ল্ড ভিশন"-এর মতো সংস্থাগুলি প্রাথমিকভাবে মানবিক সহায়তা প্রদান করে, তবে এইসব সহায়তার মধ্য দিয়ে তারা খৃষ্টধর্মের প্রতিকৃতি তৈরি

করে। এই সমস্ত সংস্থাগুলি তাদের বাজেটের ৯০% খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের পেছনে ব্যয় করে থাকে।

**১৯৭৮ সালে লুওয়াজিন কনফারেন্সের ঐতিহাসিক প্রভাব**

১৯৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার লুওয়াজিনে এক ঐতিহাসিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিশ্বের দেড়শ খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও ধর্মনেতা অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্সে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমগ্র বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম সমাজের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারে সমন্বিত কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। তাদের আলোচনা ও পরামর্শের মধ্যে মূল বিষয় ছিল, মুসলমানদের মাঝে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য সরাসরি দাওয়াতের পাশাপাশি, মুসলিমদের মধ্যে নৈতিক এবং চারিত্রিক স্খলন ঘটানো এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। খ্রিস্টান মিশনারি নেতারা জানতেন যে, যদি তারা মুসলমানদেরকে সরাসরি খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে না পারেন, তবে অন্তত তাদেরকে ধর্মীয়ভাবে দুর্বল করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি আস্থা কমে যায় এবং খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

এই কনফারেন্সের ফলস্বরূপ একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা পরবর্তীতে স্যামুয়েল জেইমারের নামে পরিচিতি লাভ করে। স্যামুয়েল জেইমার ছিলেন একজন উগ্র খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক, যিনি মুসলিম সমাজে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি মুসলিমদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করার কৌশল নির্ধারণ করে এবং বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে কার্যক্রম চালাতে থাকে।

**আমেরিকার খ্রিস্টান মিশনারি রিপোর্টের উদ্বেগজনক তথ্য**

অতি সম্প্রতি, একটি আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠান তাদের তেরতম বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টে খ্রিস্টান মিশনারিদের অতীত সফলতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে সারা পৃথিবীজুড়ে খ্রিস্টানরা বাইবেলের প্রায় ২৮ বিলিয়ন কপি বিতরণ করেছে, যা একটি ব্যাপক ধর্মীয় প্রচারের নিদর্শন। এছাড়া, বিশ্বের প্রধান বড় লাইব্রেরীগুলোর মধ্যে যীশু খ্রিস্টের নামে লেখা বই-পত্রের সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে গেছে। খ্রিস্টানরা দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের মিশনারি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যেখানে এখনও খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার পৌঁছায়নি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খ্রিস্টান মিশনারির এই পরিকল্পনা ভবিষ্যতে মুসলিম দেশগুলোতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে এই কার্যক্রমের সফলতা অনেকাংশে বাড়ছে।

**মিশনারি কার্যক্রমের সাম্প্রতিক অবস্থা**

বর্তমানে, বাংলাদেশে মিশনারি কার্যক্রম আগের চেয়ে আরো বহুলাংশে বেড়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও, বিশেষ করে খৃষ্টান ধর্মীয় সংস্থাগুলি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংস্থাগুলি শুধু মানুষের উপকারে আসার কথা বলে, কিন্তু মূলত তাদের আড়ালে ধর্মীয় দীক্ষা দেওয়ার কাজটি পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে প্রায় ৫ লাখ খৃষ্টান রয়েছে, যার মধ্যে ১ লাখ ৩৪ হাজার মানুষ ব্যাপটিস্ট খৃষ্টান।

**বাংলাদেশে মিশনারি কার্যক্রমের ভবিষ্যত**

বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান দেশে মিশনারি কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। মিশনারি সংস্থাগুলি তাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার, স্বাস্থ্যসেবার এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের আড়ালে ব্যাপকভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে, এই কর্মকাণ্ডের ফলে যে ধর্মীয় ভেদাভেদ এবং সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে, তা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত।

এনজিওগুলোর কার্যক্রম: খৃষ্টান মিশনারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা

বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারি এনজিওগুলো দীর্ঘদিন ধরে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে, যা মূলত খৃষ্টধর্মের প্রচার এবং উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে। এসব এনজিও সাধারণত দুঃস্থ, নিরক্ষর, এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সেবা প্রদান করে, তবে তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হলেও, ধর্মীয় উদ্দেশ্যটি প্রাথমিক। এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য খৃষ্টান মিশনারি সংস্থার কার্যক্রম বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

**১. চার্চ অফ বাংলাদেশ**

ডঃ জিগা বি. আলসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত "চার্চ অফ বাংলাদেশ" একটি খৃষ্টান মিশনারি এনজিও। ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে "মেমোরিয়াল হসপিটাল" নামে একটি খৃষ্টান হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এলাকার জনগণ ছিল অভাবী ও নিরক্ষর, এবং ডঃ আলসেন তাদের সেবা দেওয়ার মাধ্যমে ৩৮ বছর ধরে মালুমঘাটের চকরিয়া অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। ১৯৬৪ সালে যেখানে খৃষ্টান একটিও ছিল না, সেখানে তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০০৩ সালের মধ্যে ৪০,০০০ খৃষ্টান তৈরী হয়। তারা আশেপাশের জমি ক্রয় করে নতুন খৃষ্টানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া চট্টগ্রামের দৌলতপুরে মরিয়াম আশ্রমের পাশে বিশাল খৃষ্টান এলাকা গড়ে তুলেছে এবং পাহাড়ী অঞ্চলে গির্জাও নির্মাণ করেছে।

**২. সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট**

"সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট" খৃষ্টান মিশনারি তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে ৮৫টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনা করে, যেখানে মুসলমানের সন্তানদের ভর্তি নেওয়া হয় না। ১৯৯০-৯১ সালে, এই সংস্থা ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করে বহু মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে। এই

মিশনারি সংস্থার কর্মকাণ্ডে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং ধর্মীয় কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার অন্যতম উদ্দেশ্য।

**৩. মিশনারির স্বরূপ সন্ধানে**

বিশ্বব্যাপী খৃষ্টধর্ম প্রচারের কর্মকাণ্ডগুলো বিভিন্ন দেশে বিশেষত মুসলিম বিশ্বে সেবার ছদ্মাবরণে চালানো হচ্ছে। অনেকের মনে প্রশ্ন আসে, "খৃষ্টধর্ম কি আসলেই ঐশী ধর্ম?" যদি তা ঐশী ধর্ম হয়, তবে কেন মিশনারিরা প্রচারে এত অপপ্রচার ও প্রলোভন ব্যবহার করে থাকে? পশ্চিমা সমাজের নৈতিক অধঃপতন, ব্যক্তি স্বার্থের চরম বৃদ্ধি, এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছে। তবে খৃষ্টধর্মের প্রচারকারীরা, তাদের প্রচার কার্যক্রমে নানা কুটচাল প্রয়োগ করছে এবং সমাজের ক্ষতিসাধন করছে।

**৪. খৃষ্টান প্রকাশনা**

মিশনারি সংস্থাগুলি বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে থাকে। যেমন, **বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি** (বি.বি.এস.) **১৯৬৩** সালে বাংলা ভাষায় "ধর্ম পুস্তক" হিসেবে বাইবেল প্রকাশ শুরু করে, পরবর্তীতে এটি "পবিত্র বাইবেল" নামে প্রকাশিত হয়। এই পরিবর্তন ও প্রচ্ছদের মাধ্যমে বাইবেলকে "কিতাবুল মুকাদ্দাস" নামে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। এভাবে তারা ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে বাইবেলের পুস্তককে ইসলামিক শোভায় সজ্জিত করে, যাতে মুসলিম জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

**৫. অপকৌশল ও ধর্মান্তরিতকরণ**

মিশনারিরা ইসলামিক ঐতিহ্য ও পরিভাষা ব্যবহার করে তাদের ধর্মীয় বই ও পুস্তক প্রকাশ করছে। তারা ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে যেমন "আদিপুস্তক" (আল-তৌরাত), "প্রথম সিপারা" (পয়দায়েশ), "ইশ্বর" (আল্লাহ), "ঈশ্বর পুত্র" (ইবনুল্লাহ), "ভরসা" (ঈমান) এবং "আব্রাহাম" (ইব্রাহীম) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলমানদের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করে থাকে।

এছাড়া তারা ইসলামী নকশা ও সজ্জায় বাইবেল প্রকাশ করে, যাতে মুসলিমরা এটি কুরআন বা হাদিসের বই মনে করে পড়ে। তাদের প্রতিটি বইয়ে কুরআনের কিছু আয়াতের অংশ সরাসরি যুক্ত করা হয়, যা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে সাহায্য করে।

**৬. ইসলামী পরিভাষা ও নামের চুরির কৌশল**

মিশনারি সংস্থাগুলির মধ্যে একটি প্রচলিত কৌশল হচ্ছে ইসলামী পরিভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে বাইবেলের রূপান্তর করা। যেমন, "আব্রাহাম" নামকরণ করা হয় "ইব্রাহীম", "মোশি" নামকরণ করা হয় "মুসা", "যীশুখৃষ্ট" নামকরণ করা হয় "ঈসা মসীহ", "দূত" শব্দ ব্যবহার করা হয় "ফেরেশতা", এবং "পোয়ালাত" ব্যবহৃত হয় "কাফফারা" হিসেবে। এর মাধ্যমে তারা খৃষ্টান ধর্মের সাথে ইসলামের একীকরণ এবং ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ভাবনা তৈরি করতে চায়।

**৭. ১৬ বছর ধরে চলা জালিয়াতি**

মিশনারিরা দীর্ঘ ১৬ বছরের প্রচেষ্টায় কুরআনের কিছু আয়াত চুরি করে তাদের কথা প্রচারের মাধ্যমে বাইবেল প্রকাশ করে, যাতে মসজিদের কাঠামোর সাথে তাদের প্রকাশনা মিলিয়ে দেয়া হয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি হলো কুরআনের আধ্যায় সমূহ থেকে অংশবিশেষ নিয়ে বাইবেলের মধ্যে ঢোকানো, যা মুসলমানদের জন্য ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে।

**৮. অপবিজ্ঞাপন ও ধর্মীয় অপব্যাখ্যা**

মিশনারিরা কুরআনের কিছু অংশের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা দেয় এবং বাইবেল বা তাদের বইয়ের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। এতে মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং তারা খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

**৯. প্রচারের কার্যক্রমে ভাগাভাগি**

১৯৬৮ সালে, ঢাকা মহাপ্রদেশকে চারটি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত করা হয়, যার মাধ্যমে তারা চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, খুলনা, এবং ময়মনসিংহ এলাকায় খৃষ্টধর্মের প্রচার কার্যক্রম চালায়। এই অঞ্চলে বিশেষভাবে তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়। ১৯৯৭ সালে, "ওয়ার্ল্ড ভিশন" নামক সংগঠনের অর্থ পরিকল্পনা ছিল ২১২৯ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার, যা তাদের কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়।

**প্রচার ও প্রচারণার অপকৌশল: খৃষ্টান ধর্মান্তরিত করার গভীর ষড়যন্ত্র**

খৃষ্টান ধর্মান্তরের একটি গুপ্ত কৌশল হচ্ছে গোপনে ইসলামিক সমাজে ও মুসলিম দেশের ভিতরে খৃষ্টান মিশনারির কার্যক্রমকে প্রসারিত করা। এই ধরনের ধর্মান্তর প্রচারণা এমন একটি জটিল এবং গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে কাজ করছে, যা মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি এবং ইসলামিক সমাজের মৌলিক বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে নষ্ট করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

**ধর্মান্তর: মিশনারি কার্যক্রম ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট**

বাংলাদেশে ধর্মান্তর ও মিশনারি কার্যক্রম একটি সংবেদনশীল এবং বিতর্কিত বিষয়। এই প্রবন্ধে ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া, মিশনারিদের ভূমিকা, তাদের কার্যক্রম, এবং এর ফলে সমাজে সৃষ্ট প্রভাবের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

**ধর্মান্তরের ঐতিহাসিক পটভূমি**

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তি যখন ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন থেকেই মিশনারি কার্যক্রম শুরু হয়। ১৮৫৭ সালে ব্রিটেনের একটি কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ভারতীয় উপমহাদেশকে খ্রিস্টান ধর্মের প্রসারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তাদের মতে, এটি "খ্রিস্টীয় রাজ্যে" রূপান্তরের একটি পবিত্র দায়িত্ব। (সূত্র: **তারীখে পাকিস্তান**)

## বাংলাদেশে মিশনারি কার্যক্রমের উত্থান

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই দেশটি ইউরোপীয় এবং অন্যান্য দেশের মিশনারিদের জন্য একটি নতুন সুযোগের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। বিশেষত দেশের পাহাড়ি অঞ্চল, সিলেট, নেত্রকোণা, এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে মিশনারিরা তাদের কার্যক্রমের কেন্দ্র স্থাপন করে। এ অঞ্চলে বহু উপজাতি জনগোষ্ঠীর বসবাস, যারা ঐতিহ্যগতভাবে বৌদ্ধ, হিন্দু বা প্রকৃতিপূজারী।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪৫টি উপজাতির মধ্যে পার্বত্য তিন জেলায় ১৪টি উপজাতি রয়েছে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, এবং অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে মূলত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা বেশি ছিল। তবে, মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এখানে অভাবনীয় হারে বেড়েছে। (সূত্র: **ইসলামিক ফাউন্ডেশন রিপোর্ট, ২০১১**)

## ধর্মান্তর কৌশল এবং এর প্রভাব

মিশনারিরা সাধারণত তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে সেবার নামে। হাসপাতাল, ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তুলে তারা দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। বান্দরবান জেলার উদাহরণ দিলে, রুমা উপজেলায় মারমা ও বোম সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় বর্তমানে ৬০ শতাংশ জনসংখ্যা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী।

একটি ঘটনায় দেখা যায়, রুমা বাজার থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আশ্রম পাড়ায় কয়েকটি ত্রিপুরা পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আর্থিক সংকটে পড়ে তারা খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছে সাহায্যের জন্য যায়। মিশনারিরা তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে। (সূত্র: **দৈনিক ইনকিলাব, ২০১৪**)

## খ্রিস্টান মিশনারিদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা

ইউরোপীয় দাতা সংস্থাগুলি ধর্মান্তর প্রক্রিয়ায় বড় ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, UNDP প্রতিবছর ২০ লাখ মার্কিন ডলার বাজেট নির্ধারণ করে মিশনারি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য। এছাড়া অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও অর্থ সহায়তা প্রদান করে। কক্সবাজারের মালুমঘাটে "চার্চ অব বাংলাদেশ" পরিচালিত একটি মেমোরিয়াল হাসপাতাল খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬৪ সালে যেখানে কোনো খ্রিস্টান ছিল না, ২০০৩ সালে সেখানে প্রায় ৪০ হাজার খ্রিস্টান রয়েছে। এটি একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ বলে অনেকে মনে করেন। (সূত্র: **দৈনিক ইনকিলাব, ২০০৩**)

## মিশনারি কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশনারি কার্যক্রম নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। একটি উদাহরণ হলো ২০১৩ সালে ঢাকার বাসাবো এলাকায় পাঁচজন নওমুসলিম অভিভাবক এবং তাদের সন্তানদের পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। পরে তাদের কাগজপত্র যাচাই করে মুক্তি

দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েকজন নওমুসলিম শিশুকে মিশনারিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, যা স্থানীয়ভাবে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি করে। (সূত্র: **দৈনিক ইনকিলাব, ২০১৩**)

**ধর্মান্তরের গতি এবং ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস**

**১৯৯২** সালে বাংলাদেশে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ। ২০০০ সালে তা **১** কোটিতে উন্নীত হয় এবং বর্তমানে এটি **১** কোটি ২৫ লক্ষে পৌঁছেছে। এই বৃদ্ধি শুধু সংখ্যাতাত্ত্বিক নয়, বরং সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব ফেলেছে।

ধর্মান্তর এবং মিশনারি কার্যক্রম একটি জটিল এবং বহুমুখী বিষয়। এটি শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর সঙ্গে রাজনৈতিক এবং সামাজিক উপাদানও জড়িত। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য ও নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন, যা দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

**ধর্মান্তর ও আর্থ-সামাজিক আগ্রাসন: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট**

**ধর্মান্তরের প্রেক্ষাপট এবং ক্রিয়াকৌশল**

**১৯৮৬** খ্রিস্টাব্দ থেকে পিটারসনের নেতৃত্বে **আর.ডি.আর.এস (RDRS)** সংস্থা দিনাজপুর ও রংপুর জেলার সীমান্ত অঞ্চলে আদিবাসী ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করে। এই অঞ্চলে তারা বিশেষত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে।

পটুয়াখালী জেলার উপজাতি রাখাইন সম্প্রদায়ও এই আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। **রাখাইন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মি. উসিথ মং** এর মতে, গত ৩৫ বছরে প্রায় ৯০% রাখাইনকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এটি যে শুধুমাত্র সামাজিক বা ধর্মীয় পরিকল্পনার অংশ নয়, তা স্পষ্ট হয় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক খ্রিস্টীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনার শিকড় **১৯৪৭** সালের ভারত বিভক্তির সময়ে দেখা যায়, যখন খ্রিস্টানরা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তোলে।

(সূত্র: **পাক্ষিক দেশ জগত; ২০০৭ খ্রি.**)

**অর্থনৈতিক আগ্রাসন: পুঁজিবাদ ও সুদী ব্যবস্থা**

অর্থনৈতিক আগ্রাসনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল পুঁজিবাদী অর্থনীতি। পুঁজিবাদের মূলনীতি **"চাহিদা ও যোগান"**। এ ব্যবস্থার উদ্যোক্তা ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যবস্থা সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর আঘাত হানছে।

**পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকসমূহ**

**১. নৈতিকতার অবক্ষয়**

শুধু চাহিদা অনুযায়ী যোগান দেওয়া হয়। এতে হালাল-হারামের কোনো বাছ-বিচার থাকে না।

উদাহরণস্বরূপ, মদ, গাঁজা, ইয়াবা ইত্যাদির চাহিদা থাকলে সেগুলোরই যোগান দেওয়া হবে। এর ফলে মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. **সুদের ব্যাপকতা**

সুদ মানুষের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে। ধনী আরো ধনী হয়, গরিব আরো গরিব হয়। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এ ধরনের অব্যবস্থা নেই।

**সুদী প্রতিষ্ঠান ও তাদের কার্যক্রম**

- **গ্রামীণ ব্যাংক:** ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের জন্য পরিচিত। সুদের হার প্রায় ২০%।
- **ব্র্যাক:** বাংলাদেশে ৬৪টি জেলায় তাদের কার্যক্রম রয়েছে। ব্র্যাক ব্যাংক, বিকাশ, এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক কার্যক্রম তাদের আয়ের উৎস।
- **আশা (ASHA):** ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এরা ৩২৩৬টি শাখার মাধ্যমে সারা দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

(সূত্র: **গ্রামীণ ফাউন্ডেশন ও ব্র্যাক নেট ওয়েবসাইট**)

**মুসলমানদের অবনতি: কর্মসংস্কৃতির অভাব**

**আল্লামা শফী (রহ.)** তার বিখ্যাত গ্রন্থ **তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন**-এ মুসলমানদের কর্মসংস্কৃতির অভাবের উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, মুসলমানরা আজ অমুসলিমদের কৃষ্টি-কালচার অনুসরণ করলেও তাদের পরিশ্রম, কর্মনিষ্ঠা ও বাণিজ্যিক উন্নতি অনুসরণ করে না।

তিনি উল্লেখ করেন:

- চাষাবাদের জন্য জমি ও কৃষকের প্রয়োজন।
- ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগ প্রয়োজন।
- অলসতা কোনো ধর্মেই ইবাদত নয়, এমনকি ইসলামেও নয়।

মুসলমানদের উচিত ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বৈধ উপায়ে অর্থ-সম্পদ ও প্রযুক্তির অন্বেষণ করা।

(সূত্র: **সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন; পৃষ্ঠা ৫৬, সূরা বাকারা- ১১৩**)

ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক আগ্রাসন শুধু একটি জাতি বা ধর্মের উপর আঘাত নয়, এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপরও হুমকি সৃষ্টি করে। তাই মুসলমানদের উচিত ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকতা রক্ষা করার পাশাপাশি বৈধভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা।

1. **বিশ্বাসগত সংস্কৃতি:** লেখক বলছেন যে মুসলিম সংস্কৃতিতে বিভিন্ন বিজাতীয় এবং বিকৃত উপাদান ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি মুসলিমদের নিজের আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

2. **ব্যবহারিক জীবন:** সংস্কৃতি পরিবর্তনের কারণে মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনেও অনেক বিজাতীয় অভ্যাস প্রবেশ করেছে বলে দাবি করা হয়েছে, যা মুসলিম আদর্শের পরিপন্থী।

3. **মননগত সংস্কৃতি:** এই ক্ষেত্রেও পশ্চিমা অপসংস্কৃতি প্রভাব ফেলছে এবং মুসলিম সমাজের চিন্তা-চেতনায় অবক্ষয় ঘটাচ্ছে।

4. **পারিবারিক ও সামাজিক পরিবর্তন:** বিদেশি এনজিওদের প্রভাব এবং নারী স্বাধীনতার অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলিম পরিবার নীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

এসব কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিম সমাজকে তাদের মূল আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারায় সম্পূর্ণভাবে আসক্ত করা।

**বিদেশী এনজিও এবং খ্রিস্টান সংস্থাগুলোর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং কৌশল**

বাংলাদেশে খ্রিস্টান এনজিও ও বিদেশী সংস্থাগুলো কেবল মানবিক কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতায় কাজ করে না, বরং নানা সময় তারা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারেও জড়িয়ে পড়ে। এসব সংস্থা স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আড়ালে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। তাদের কাজের মধ্যে মূলত দেখা যায় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানের নামে তারা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে।

বিভিন্ন সাধারণ নির্বাচনে এরা নিরপেক্ষতার নীতি ভঙ্গ করে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকে। অনেক সময় এই সংস্থাগুলো রাজনৈতিক প্রার্থী দাঁড় করায় এবং সরাসরি নির্বাচনে অংশ নেয়। উদাহরণস্বরূপ, গত উপজেলা নির্বাচনে প্রায় ৪০০ জন প্রার্থী এনজিওগুলোর সমর্থনে নির্বাচনে অংশ নেয়, যার মধ্যে ১০ জন চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হয়েছে। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার নির্বাচনে ভূমিহীন সমিতির অনেক মহিলাকে এনজিওগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় নির্বাচিত হতে দেখা গেছে।

**ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কৌশল**

ইসলামী সমাজব্যবস্থার ওপর আঘাত হানতে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান শক্তি নানা সময় তৎপরতা চালায়। ২০১৩ সালের ৫ মে'র হেফাজতে ইসলামের ঘটনার মাধ্যমে দেখা যায়, এই

আন্তর্জাতিক লবিগুলো কীভাবে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নারী কর্মজীবীদের ব্যবহার করেছে। হেফাজতের ১৩ দফা দাবির মধ্যে ৪ ও ৫ নং ধারা বাস্তবায়ন রোধে তারা সরাসরি ইন্ধন জুগিয়েছে। এই ধারাগুলোতে নারীদের নিরাপদ কর্মসংস্থানের অধিকার এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার বিষয় ছিল।

**ইসলামী রাষ্ট্রে বিদেশী হস্তক্ষেপ**

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান শক্তি গোয়েন্দা সংস্থা যেমন মোসাদ এবং সিআইএ'র মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চায়। এ জন্য তারা মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপ্রধানদের মাধ্যমে ইসলামী সরকারের উৎখাতের ষড়যন্ত্র চালিয়ে থাকে। এছাড়াও ইসলামী দলগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিতর্কিত ব্যক্তিদের নিয়োগ এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা তাদের কৌশলের অংশ।

**কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র**

কওমী মাদরাসা হলো মুসলিম জাতির জীবনীশক্তি। এটি কুরআন-হাদিসের শিক্ষা প্রদান করে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা করে। কিন্তু ইয়াহুদী-খ্রিস্টান লবিগুলো কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মাদরাসাগুলোকে "জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র" বলে অভিহিত করছে এবং এগুলোকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় এনে ইসলামী শিক্ষার ধারা বন্ধ করতে চাচ্ছে। অথচ কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীরা কখনোই খুন, ধর্ষণ বা ডাকাতির মতো অপরাধে জড়িত হয়নি।

**ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রোপাগান্ডা ও সন্ত্রাসবাদ দমন কৌশল**

বিশ্বজুড়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে তথাকথিত সন্ত্রাস দমন অভিযানের নামে বিদেশী শক্তি প্রবেশের সুযোগ নিচ্ছে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে যুদ্ধ ও দখলদারিত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের সেনা স্কুলে হামলার মতো ঘটনাগুলো এ ধরনের ষড়যন্ত্রের উদাহরণ। এসব কার্যক্রম ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য সাজানো নাটক মাত্র।

**সমাধান ও সজাগতা**

মুসলিম জাতির অস্তিত্ব রক্ষা এবং ইসলামী শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আমাদের সজাগ হতে হবে। কওমী মাদরাসাগুলোর শক্তি ও গুরুত্ব বুঝে এগুলোকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। ইসলামী মূল্যবোধ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে, তা মোকাবিলায় আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র চলছে। এসব ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচতে হলে

কুরআন-হাদিসের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আমাদের সচেতন হতে হবে যেন আমরা কোনোভাবেই এই ষড়যন্ত্রের শিকার না হই।

**ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ষড়যন্ত্র ও মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ: মুসলিম জাতির প্রতি প্রভাব**

ইতিহাসের পাতা ঘাটলে দেখা যায়, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান জাতির অভ্যন্তরে গভীর ষড়যন্ত্র এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের নাম দিয়ে বিশ্বব্যাপী মানবতার উপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে। এর পেছনে তাদের ধর্মীয় কিতাব তালমুদের ভূমিকা অন্যতম। বর্তমান ইয়াহুদীরা তাওরাতের পরিবর্তে তালমুদকে তাদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে মেনে থাকে। তাদের এই ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মপন্থা অনেক ক্ষেত্রেই মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

**তালমুদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ:**

১. ইয়াহুদীরা আল্লাহর প্রিয় জাতি এবং আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের মতো।
২. পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণ ইয়াহুদীদের জন্য নির্ধারিত। ৩. অ-ইয়াহুদীদের ধন-সম্পদ এবং জীবন সম্পূর্ণ অমুল্য এবং তা দখল করা ইয়াহুদীদের অধিকার। ৪. মিথ্যা সাক্ষ্য এবং প্রতারণা তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে বৈধ, যদি তা ইয়াহুদীদের জন্য উপকারী হয়। ৫. অ-ইয়াহুদীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস অথবা দাসত্বের অধীন করা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব।

**ইয়াহুদীদের মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ:**

বিশ্ব মিডিয়ার প্রধান শক্তিগুলো ইয়াহুদীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তারা নিজেদের প্রচারণার মাধ্যমে সত্যকে বিকৃত করে এবং মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করে। মিডিয়াকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তারা মুসলিম জাতি এবং অন্যান্য নির্যাতিত জাতিগুলোর উপর খবরদারি করে।

**বিশ্বের প্রধান সংবাদ সংস্থাগুলোর ইয়াহুদী কর্তৃত্ব:**

- **রয়টার্স:** বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংবাদ সংস্থা। এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস রয়টার্স, একজন ইয়াহুদী, ১৮১৬ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন।
- **বিবিসি (BBC):** বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রচারমাধ্যম। এটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইয়াহুদীদের নিয়ন্ত্রণে।
- **ভয়েস অব আমেরিকা (VOA):** আমেরিকার অন্যতম প্রধান প্রচারমাধ্যম। এর মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়।
- **এপি, ইউপি, এএফপি:** এই সংবাদ সংস্থাগুলোর উপরও ইয়াহুদীদের প্রভাব অপরিসীম।

**মিডিয়ার মাধ্যমে ষড়যন্ত্র:**

১. মুসলিমদের ঐতিহাসিক বিজয় ও সাফল্যগুলোকে প্রচার থেকে দূরে রাখা।
২. মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করা।
৩. সন্ত্রাসবাদের মতো জঘন্য কর্মকাণ্ডের জন্য মুসলমানদের দায়ী করা।
৪. মুসলিম নিধন এবং তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে টার্গেট করা।

**বিল্ডারবার্গ এবং ফ্রি ম্যাসন: গোপন সংগঠনের ভূমিকা**

বিল্ডারবার্গ এবং ফ্রি ম্যাসন হলো বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোপন সংগঠন। এদের মূল লক্ষ্য হলো,

- বিশ্বব্যাপী শাসকদের নিয়ন্ত্রণ করা।
- মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।
- ইসরায়েল এবং পাশ্চাত্যের আধিপত্য বিস্তার করা।

**ইয়াহুদী-খ্রিস্টান মিডিয়া কৌশল এবং মুসলিম জাতি:**

তাদের মিডিয়া কার্যক্রমের মাধ্যমে, বিশেষ করে প্রোপাগান্ডা এবং তথ্য বিকৃতির মাধ্যমে, মুসলিম জাতিকে পিছিয়ে রাখার চেষ্টা করে আসছে।

**আমাদের করণীয়:**

- **শিক্ষা:** ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো।
- **মিডিয়ার ব্যবহার:** আমাদের নিজেদের মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের প্রকৃত চিত্র বিশ্বব্যাপী তুলে ধরা।
- **ঐক্য:** মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
- **সতর্কতা:** ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং তাদের মোকাবিলায় কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। তবে তাদের মিডিয়ার কৌশল এবং গোপন সংগঠনের মাধ্যমে চালানো তথ্য সন্ত্রাস বর্তমানে মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ে তুলে আমাদের এই ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে।

**ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের প্রেক্ষাপট:**

**১. ভূমি দখল ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি:**

- ফিলিস্তিনের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি কম হওয়া এবং ইসরায়েলের দ্রুত বৃদ্ধি একটি বাস্তব দিক। তবে, এটি কেবল দখলদারিত্ব বা জনসংখ্যা নীতির ফল নয়; এখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং রাজনৈতিক কারণগুলোও ভূমিকা রাখে।
- ইসরায়েলের সামরিক আধিপত্য এবং ফিলিস্তিনিদের মানবিক সংকট বিশ্বব্যাপী সমালোচিত।

**২. আন্তর্জাতিক প্রভাব:**

- যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন ইসরায়েলের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।
- জাতিসংঘের ভূমিকা এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য কার্যকর সমাধানের অভাব পরিস্থিতি আরও জটিল করেছে।

**ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং এর সমালোচনা:**

**১. ইহুদী-খ্রিস্টান ষড়যন্ত্রের ধারণা:**

- এই ধারণাটি অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ ও বিশ্লেষকদের মধ্যে প্রচলিত। তবে এটি সব সময় বাস্তবিক প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, বরং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়িত হয়।
- এসব তত্ত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব ফেললেও, এগুলো নিয়ে আলোচনা করার সময় বস্তুনিষ্ঠতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা জরুরি।

**২. শয়তান সম্প্রদায় ও গুপ্ত সংগঠন:**

- শয়তান পূজার বিষয়টি বাস্তবতায় কতটা প্রভাব ফেলেছে তা পরিষ্কার নয়। এটি অনেক সময় ধর্মীয় কাহিনী ও সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিশে যায়।
- গুপ্ত সংগঠন যেমন মোসাদ ও ফ্রি মেসন সম্পর্কে প্রচলিত তত্ত্ব বাস্তবতার সঙ্গে মিলে গেলেও সব দাবি যাচাইযোগ্য নয়।

**নকল ইমাম তৈরি করা:**

একটি প্রাথমিক কৌশল হিসেবে, খৃষ্টান মিশনারির সদস্যরা মুসলিম দেশে ছদ্মবেশী ইমাম তৈরি করে, যারা ইসলামিক মতাদর্শের সাথে খৃষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি মিশিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে তারা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং আদর্শে পরিবর্তন আনতে চায়। এ বিষয়ে পাদ্রীদের মধ্যে একটি সভায় পাদ্রী "জবাজ" বলেন, "মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের বিতর্কে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করা।"

**ইসলামী নাম ধারণ:**

খৃষ্টান মিশনারি সদস্যরা বর্তমানে ইসলামী নাম ধারণ করার মাধ্যমে নিজেদের ধর্মান্তরিত উদ্দেশ্য লুকানোর চেষ্টা করছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা নাম রাখছে আবদুল ওয়াহহাব, সুলতান আহমেদ, বা আব্দুল হালিম। এমনকি তারা নিজেদের পরিচয় দেয় "ঈসায়ী মুসলমান" হিসেবে, যার মাধ্যমে তারা ইসলামের মতোই একটি নাম ও সঠিক বিশ্বাস গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের অন্তর্গত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে খৃষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী বানানো।

**যুবতী প্রচারক:**

খৃষ্টান মিশনারির মহিলা সদস্যরা ইসলামী সমাজে এসে তাবলীগের নাম ব্যবহার করে মুসলিম নারীদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছে। এসব নারীরা প্রশিক্ষিত খৃষ্টান মিশনারি হয়ে মুসলিম সমাজে পুরুষদের সাথে বিবাহিত হয় এবং তাদের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করে। একইভাবে, মহিলা ফেরি-ওয়ালাদের মাধ্যমে তারা

বিভিন্ন ধর্মীয় প্রচার কাজ পরিচালনা করে থাকে। তাদের লক্ষ্য হলো, ভবিষ্যতে মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া শিশুরা যেন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।

**এনজিওগুলোর মাধ্যমে ধর্মান্তর:**

অনেক বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও খৃষ্টান ধর্মান্তরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে এসব এনজিও তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে দরিদ্র জনগণের মধ্যে ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে। এসব এনজিও এবং মিশনারি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো মুসলিম সমাজের মধ্যে ধর্মান্তরিত জনগণের সংখ্যা বাড়ানো, এবং একটি নতুন খৃষ্টান জনগণের সৃষ্টি করা।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় খৃষ্টান জনগণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ লাখ। তবে ২০১০ সালে মদিনা ইউনিভার্সিটি একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করে, যেখানে দেখা যায় যে বর্তমানে বাংলাদেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। গত কয়েক দশকে খৃষ্টান জনগণের সংখ্যা ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বৃদ্ধি মূলত ধর্মান্তরের মাধ্যমে হয়েছে, কারণ জন্মনিয়ন্ত্রণের মতবাদ অনুসারে খৃষ্টানদের সন্তানসংখ্যা সাধারণত কম থাকে।

**মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে ধর্মান্তর:**

খৃষ্টান মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে ধর্মান্তরের একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা। এসব স্কুলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের খৃষ্টান ধর্মের শিক্ষা দেয়া হয়। "যীশু খৃষ্টের জীবনী" বা "বাইবেল" সম্পর্কিত বইগুলো বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হয় এবং ছোটদের মগজধোলাই করা হয়। মিশনারি প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পড়াশোনা করা মুসলিম ছাত্ররা ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করতে শুরু করে এবং খৃষ্টান সমাজের অংশ হিসেবে নিজেদের মেনে নেয়।

**সমিতির মাধ্যমে ধর্মান্তর:**

মিশনারি সংগঠনগুলো গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন সমিতি গড়ে তুলে। এসব সমিতির সদস্যদের বাইবেল পড়ানো হয় এবং বিভিন্ন সিডি প্রদর্শন করে যীশু খৃষ্টের জীবনের গল্প ও খৃষ্টান ধর্মের প্রচার করা হয়। এর পাশাপাশি, মিশনারি সংগঠনগুলো ধর্মান্তরিত মানুষদের সামাজিক ও আর্থিক সুবিধা দেয়, যেমন চাকরি, ঋণ ও অন্যান্য প্রলোভন, যা তাদেরকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

**স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে ধর্মান্তর:**

খৃষ্টান মিশনারি সংগঠনগুলো গরীবদের চিকিৎসা সেবার নামে তাদের ধর্মান্তর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে গরীব মানুষদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়, এবং তাদের সাথে খৃষ্টান ধর্মের উপদেশও দেয়া হয়। অসহায় মানুষের এই দুরবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের ধর্মের প্রচার করছে। এসব স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোকে ধর্মান্তরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

**পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীন খৃষ্টান রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র:**

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে খৃষ্টান মিশনারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা সেখানে একটি খৃষ্টান রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করছে। একাধিক আন্তর্জাতিক খৃষ্টান সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি আলাদা খৃষ্টান রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বৃহত্তর খৃষ্টান রাষ্ট্র সৃষ্টি করা, যেখানে বাংলাদেশ, ভারত ও পার্বত্য অঞ্চলের খৃষ্টান জনগণ একত্র হয়ে তাদের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অভ্যুদয় ঘটাতে পারবে।

খৃষ্টান ধর্মান্তরের অপকৌশল

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে খৃষ্টান ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য মিশনারি সংস্থাগুলো নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও কৌশল ব্যবহার করছে। বাংলাদেশে বিশেষ করে, খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য তারা একাধিক অদৃশ্য কৌশল প্রয়োগ করছে, যার মধ্যে ধর্মান্তরিত করার জন্য ভিন্ন ধরনের সামাজিক, ধর্মীয় ও মানবিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ধরনের কার্যক্রমগুলো সাধারণত জনগণের বিশ্বাস এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্ম পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এমন কিছু কৌশল, যা খৃষ্টান মিশনারি সংস্থাগুলো ব্যবহার করছে, তা নিম্নে বিস্তারিত আলোচিত হল।

**কৌশল ১: মিশনারি হাসপাতালে ধর্মান্তরের প্রচেষ্টা**

যশোরে অবস্থিত "ফাতেমা" নামক একটি হাসপাতাল খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যবহৃত একটি প্রধান প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন হাসপাতালটিতে প্রায় ৬০০ মুসলমান রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। এই সুযোগে মিশনারি সংস্থাগুলো রোগীদের ধর্মান্তরিত করার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এক মুসলিম রোগীকে প্রথমে বলা হয়, "এটা আল্লাহর নামে খেয়ে দেখুন", কিন্তু কোনো উপকার না হওয়ায় পরদিন তাকে বলা হয়, "এবার যীশুর নামে খেয়ে দেখুন, দেখুন আপনার রোগ সারবে কি না"। দ্বিতীয় দিন রোগী ঔষধ সেবন করার পর তার রোগ ভালো হয়ে যায়, মূলত সঠিক ঔষধ দিয়েই। এইভাবে তারা মুসলমানদের মাঝে ধর্মের প্রতি সন্দেহ এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদেরকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট করে।

**কৌশল ২: মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে ধর্মান্তর**

খৃষ্টান মিশনারি সংস্থাগুলোর একটি প্রধান কৌশল হলো স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। এসব স্কুলগুলোর মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক শিক্ষিকা ছাত্রদের থেকে প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের বাবা-মা তোমাদের বেশি ভালোবাসেন না, না তোমাদের কাজের লোকেরা?" শিশুদের উত্তর ছিল, "বাবা-মা আমাদের ভালোবাসে," তখন শিক্ষক বললেন, "যেমন তোমাদের বাবা-মা তোমাদের ভালোবাসেন, তেমনই যীশু হলেন আল্লাহর পুত্র, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা। তাহলে তোমরা বলো, আল্লাহ যীশুকে

বেশি ভালোবাসেন না মুহাম্মাদকে?" এই ধরনের চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে মুসলিম ও খৃষ্টান ধর্মের মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়, যা পরবর্তীতে তাদের ধর্মান্তরের প্রক্রিয়ায় সহায়ক হয়।

**কৌশল ৩: ইসলামী ধারণার ভুল ব্যাখ্যা**

খৃষ্টান মিশনারি সংস্থাগুলো ইসলামের মূল বিশ্বাসকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার জন্য একটি চাতুর্যপূর্ণ কৌশল গ্রহণ করে থাকে। তারা কুরআনের আয়াত তুলে ধরে যুক্তি প্রদান করে যে, ইসলামে পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনা একটি আবশ্যকীয় বিধান। উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট এলাকার মুসলিম যুবক আমীর হামজা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের পর, তার বক্তব্যে ইসলামের "ঈমান" ধারণার ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরে দাবি করেন যে, মুসলমানদের ঈমান অবশ্যই ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে মেনে নিতে হবে। তার মতে, কুরআনে "ঈমানে মুসাসসাল" অংশে নবীদের উপর ঈমান আনা আবশ্যক। এই ধরনের শাস্ত্রীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মিশনারি সংস্থাগুলো মুসলমানদের খৃষ্টান ধর্মের দিকে পরিচালিত করে।

**কৌশল ৪: মুসলিম নাম ধারণ করে ধর্মান্তরিত হওয়া**

খৃষ্টান মিশনারি সংস্থাগুলোর একটি প্রধান কৌশল হলো মুসলিম নাম ধারণ করে খৃষ্টান ধর্মের প্রচার করা। যেমন, যশোরের "ফাতেমা" হাসপাতালটিতে অনেক খৃষ্টান মিশনারি সদস্য মুসলিম নাম ধারণ করে কাজ করছে। হাসপাতালের গেটম্যান, ডাক্তারের নাম পর্যন্ত মুসলিম রাখা হয়েছে, কিন্তু মূলত তারা সকলেই খৃষ্টান। এমনকি হাসপাতালের গেটে মাদার তেরেসার ছবি সহ বিভিন্ন খৃষ্টান ধর্মীয় উপাদান সাঁটানো থাকে। এখানে মিশনারির লোকেরা রোগীদের ধর্মান্তরিত করার জন্য তাদের মাঝে গির্জার মাহাত্ম্য তুলে ধরার চেষ্টা করে। তারা মেরীর মূর্তির সামনে রোগীদের প্রণাম করার দৃশ্য প্রদর্শন করে এবং খৃষ্টান ধর্মীয় বইয়ের সাহায্যে ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যায়।

**কৌশল ৫: খৃষ্টান ধর্মের মহিমা প্রচার**

খৃষ্টান মিশনারিরা সারা পৃথিবীজুড়ে নিজেদের ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রোগমুক্তি সম্পর্কিত কাহিনীগুলি প্রচার করে থাকে। "ফাতেমা" হাসপাতালের মতো অনেক জায়গায় তারা মিশনারি গির্জা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষের মন জয় করার জন্য নানা প্রচারণা চালায়। এখানে রোগী ও দর্শনার্থীদের সেন্টার থেকে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বই সরবরাহ করা হয় এবং তাদেরকে ধীরে ধীরে ধর্মান্তরের দিকে প্রবাহিত করা হয়।

**কৌশল ৬: অনুদান ও সহায়তার মাধ্যমে ধর্মান্তর**

এছাড়াও, খৃষ্টান মিশনারি সংস্থাগুলো তাদের কাজকে তহবিল সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তারা গরীব এবং অশিক্ষিত জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য

মানবিক সাহায্যের নামে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করে। এই প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুবিধাভোগী জনগণকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। যেমন, কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় মিশনারিরা স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা প্রদান করার নাম করে মানবিক সহায়তার প্রকল্প চালিয়ে থাকে, তবে প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে ধর্মান্তরিত করা। তারা বিনামূল্যে ওষুধ, শিক্ষা, খাদ্য প্রদান করে ধর্মের দিক থেকে তাদের সুবিধা ও সুবিধাভোগীদের কাছে প্রেরণা সৃষ্টি করে।

**কৌশল ৭: যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তির সুযোগে ধর্মান্তর**

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ, অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক সংঘাতের সময়েও খৃষ্টান মিশনারি সংস্থাগুলো তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম চালিয়ে যায়। তারা সাধারণত ধর্মান্তরিত কাজের জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার শিশুদের এবং অসহায় মানুষদের বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু বানায়। যেমন আফগানিস্তান, ইরাক, সোমালিয়া, বাংলাদেশসহ অনেক মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে মিশনারি সংস্থাগুলো ধর্মান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

**মিশনারি কর্মীদের নির্লজ্জ কাহিনী**

১৭-৮-৯৮ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত রিপোর্টের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলোঃ পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানার লক্ষ্মীরাজ গ্রামে দুইজন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে নারী উন্নয়ন সংস্থা প্রধান আতাউর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ সময় ধর্ষিতারা জানান, গত ১লা আগস্ট প্রশিক্ষণের নামে ৯ জন মহিলাকে গ্রামের অফিস লক্ষ্মীরহাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত যাপনে তাদেরকে বাধ্য করা হয়। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে একটি কক্ষে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। রাত আনুমানিক ১ টার দিকে প্রতিষ্ঠানের পিয়ন অনুখুল ও মহিলা কর্মচারী লায়লা খাতুন তাদেরকে জানায়, বড় সাহেব তোমাদের সাক্ষাৎকার নিবেন। তারপর একজন একজন করে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে অবস্থানরত কয়েকজন লোক তাদেরকে রাতভর ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর থেকে পরদিন দুপুর ২টা পর্যন্ত ঐ ঘরে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। ছেড়ে দেওয়ার আগে ঘটনাটি ফাঁস না করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ভয়-ভীতি দেখানো হয়। পরে মহিলারা গ্রামে ফিরে নিজ নিজ অভিভাবককে জানালে এবং লোকমুখে ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল বের করে। সেদিন থেকে এ এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

তথ্যপঞ্জি – দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক করতোয়া, ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া, দেশ জগত। এ ধরনের বহু ঘটনা গ্রামবাংলায় ঘটছে। কোনটা পত্রিকার খবর হয়, আবার কোনটা হয় না। অনেকেই লোকলজ্জার ভয়ে এনজিওদের বর্বরতা চাপা দিয়ে রাখে।

**ইসলাম রক্ষায় খৃষ্টান মিশনারিদের ষড়যন্ত্র মোকাবেলার করণীয়**

এ পরিস্থিতিতে, মুসলিম সমাজকে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য আরও সচেতন হতে হবে। আমাদের সকলের জন্য প্রয়োজন মুসলিম যুবসমাজের মধ্যে

ইসলামের শিক্ষা ও সঠিক পথ অনুসরণের জন্য কার্যকর দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা। ইসলামের প্রতি গভীর আস্থা এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে আমরা খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা মোকাবেলা করতে পারি।

প্রথমত, আমাদের মসজিদ, ইসলামিক স্কুল এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে মুসলিম জনগণ সঠিক দিশা পায় এবং তারা খ্রিস্টান ধর্মের প্রতারণা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য গড়ে তোলা এবং বিভক্তি রোধ করা জরুরি। কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা, বিশেষ করে একতা এবং ইসলামী আদর্শের প্রচার আমাদের জন্য একটি প্রধান দায়িত্ব হতে হবে।

এছাড়া, মুসলিমদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের ধর্মীয় মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের প্রতি সজাগ থাকে। কেবল একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং ইসলামের প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখলেই আমরা খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা ও ধর্মীয় নিপীড়ন মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো।

বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের বিস্তার অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মুসলমানদের মধ্যে নৈতিক স্খলন এবং ইসলামের প্রতি আস্থাহীনতা সৃষ্টির জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে, তা থেকে উত্তরণে মুসলিম সমাজকে আরও সচেতন এবং ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের দাওয়াতি কার্যক্রম, ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইসলামিক মূল্যবোধের মাধ্যমে খ্রিস্টান মিশনারির অপতৎপরতা মোকাবেলা করা সম্ভব, এবং তা করতে হবে আমাদের দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে। বিশ্বজুড়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার পরও কিছু অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতায় মুসলমানদের ধর্মচ্যুতি ঘটছে। মিশনারিগুলোর প্রধান লক্ষ্য হলো সাধারণ মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করে তাদের খৃষ্টধর্মে নিয়ে আসা। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তারা মুসলমানদের মনোজগত পরিবর্তনের জন্য কৌশল গ্রহণ করছে। এর ফলে অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান চিরতরে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে জাহান্নামের পথে পা বাড়াচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি ও সুসংগঠিত প্রচেষ্টা। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় তুলে ধরা হলো:

**মিডিয়া ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা**

মিডিয়া বর্তমানে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। মিশনারিগুলো মিডিয়ার মাধ্যমে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার করে মুসলিম তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করছে। তাদের কৌশল মোকাবেলায় আমাদের উচিত:

1. **সত্য প্রচারের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা**
   ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মোকাবেলায় প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সত্যতা তুলে ধরা। ইসলামের

নৈতিকতা, মানবিকতা, ও শান্তিপূর্ণ বার্তা তুলে ধরতে দাঈদের (প্রচারকদের) প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

2. **ইসলামী মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করা**
ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ প্রচার, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম সম্প্রচার করা প্রয়োজন। এটি মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করবে এবং খৃষ্টান মিশনারিদের অপপ্রচার নস্যাৎ করবে।

**রাজনীতিবিদদের সচেতন করা**

খৃষ্টান মিশনারিরা কৌশলে বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। তারা রাজনীতিবিদদের উপঢৌকন প্রদান ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তাদের সমর্থন আদায় করছে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যেখানে ইসলামী আদর্শকে হেয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

**আমাদের করণীয়:**

- রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সতর্ক করা।
- সরাসরি আলোচনা ও চিঠির মাধ্যমে তাদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করা।
- মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের ইসলামী আদর্শে দৃঢ় থেকে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

**উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব**

উলামায়ে কেরাম (ইসলামী চিন্তাবিদরা) ধর্মীয় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের দায়িত্ব হলো:

1. **মিশনারিদের তৎপরতার গভীর পর্যবেক্ষণ করা**
বিভিন্ন এনজিও এবং প্রতিষ্ঠান যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।
2. **মুসলমানদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া**
গ্রামে গ্রামে মক্তব ও ইসলামিক স্কুল স্থাপন করা, যেখানে কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী শিক্ষা দেওয়া হবে।
3. **খৃষ্টান মিশনারিদের দাওয়াত দেওয়া**
খৃষ্টানদের সরাসরি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো। এটি শুধু দাওয়াতের কাজ নয়, বরং ইসলামের সৌন্দর্য প্রদর্শনের একটি মাধ্যম।
4. **ছাত্র ও যুবকদের দাওয়াতের কাজে উদ্বুদ্ধ করা**
ছাত্রসমাজকে দাওয়াতের প্রতি মনোযোগী করে গড়ে তোলা। এতে করে ইসলামের সত্য বার্তা বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

**ব্যবসায়ী ও বিত্তবানদের ভূমিকা**

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অর্থ ব্যয় করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব। আমাদের অর্থ-সম্পদের একটি বড় অংশ ইসলামের জন্য ব্যয় করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, খৃষ্টানরা তাদের আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ মিথ্যা ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যয় করে। আমাদের উচিত:

1. **ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা**
   গ্রামে ও শহরে মসজিদের সংলগ্ন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
2. **ধর্মীয় মিডিয়া প্রচারণায় সহায়তা করা**
   সত্য প্রচারের জন্য ইসলামী মিডিয়ায় বিনিয়োগ করা।
3. **সামাজিক উদ্যোগে অংশগ্রহণ**
   দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো।

খৃষ্টান মিশনারিদের ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় আমাদের প্রয়োজন একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা। মিডিয়া, শিক্ষা, দাওয়াত এবং দানশীলতা — সবক্ষেত্রেই আমাদের সচেতনতা এবং প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এ কাজে সফলতা দান করুন। আমিন।

**উৎস:**

মাওলানা মুফতী যুবায়ের, *মুসলিম বিশ্বে ইহুদী খৃষ্টানদের মরণ ছোবল*।

**কুরআনের নির্দেশনা এবং আশা:**

**১. ইমানের শক্তি:**

- কুরআন মুসলমানদের আশাবাদী থাকার এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করার নির্দেশ দেয়। এটি মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহস জোগায়।

**২. আধ্যাত্মিক শক্তি বনাম ষড়যন্ত্র:**

- সূরা আনকাবুতের উল্লেখ করা দৃষ্টান্ত মুসলমানদের মনে শক্তি ও স্থিরতা যোগায়। এটি বোঝায়, শত্রুর ষড়যন্ত্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আল্লাহর পরিকল্পনাই চূড়ান্ত।

**১. আত্মশুদ্ধি ও ঈমানের উন্নতি**

মুসলিমদের ব্যক্তিগত জীবনে **আত্মশুদ্ধি** এবং ঈমানের ভিত্তি মজবুত করা অগ্রাধিকার। দীনদার উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার মাধ্যমে দীনী শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণ করা আবশ্যক। এটি মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক পথ অনুসরণের যোগ্যতা দেবে।

**করণীয়:**

- নিয়মিত নামাজ আদায়, কুরআন তিলাওয়াত এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষার চর্চা করা।
- উলামা ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের সান্নিধ্য গ্রহণ।

**২. সরল ও পরিশ্রমী জীবনধারা**

**বিলাসী জীবন পরিত্যাগ করে সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া** একটি কার্যকর উদ্যোগ। এটি শুধু আত্মশুদ্ধির জন্য নয়, বরং উম্মাহর মাঝে সহযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলে।

**করণীয়:**

- সমাজে মিতব্যয়িতার চর্চা করা এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো।
- বিলাসিতার পরিবর্তে জীবনের প্রয়োজনীয় খাতে সম্পদ বিনিয়োগ করা।

**৩. যাকাত ও দানের সঠিক ব্যবহার**

**যাকাত** ও নফল দান দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। যাকাতের সঠিক বণ্টনের মাধ্যমে ফেতনা ও দীনহীনতার সমস্যা দূর করা সম্ভব।

**করণীয়:**

- যাকাতের সঠিক হিসাব রেখে তা যথাস্থানে পৌঁছানো।
- স্থানীয় গরীবদের জন্য সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা।

**৪. অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা**

বেকারত্বের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া মুসলিম সমাজকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। হালাল উপার্জন এবং ব্যবসার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা গুরুত্বপূর্ণ।

**করণীয়:**

- তরুণদের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- হালাল উপার্জনের মাধ্যমগুলোকে উৎসাহিত করা।

**৫. দাওয়াত ও তাবলীগ**

**দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ** মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি করে। এটি ইসলামের শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

**করণীয়:**

- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাবলীগ কার্যক্রম বৃদ্ধি।
- মানুষকে দীনের প্রতি উৎসাহিত করতে সহজ ভাষায় দাওয়াত পৌঁছানো।

**৬. ইসলামী শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণ**

মকতব, মাদ্রাসা এবং মসজিদ গড়ে তোলার মাধ্যমে দীনের প্রচার এবং প্রজন্মের মাঝে ইসলামের বোধ সৃষ্টি করা সম্ভব।

**করণীয়:**

- প্রতিটি অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি।

### ৭. সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ

**ইসলামী সংস্কৃতি প্রচলন** এবং বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা উম্মাহর পরিচয় বজায় রাখতে সাহায্য করে।

**করণীয়:**

- সাহিত্য, সংগীত, এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ প্রচার।
- সামাজিক অনুষ্ঠানে বিজাতীয় প্রভাব এড়িয়ে ইসলামী মূল্যবোধ চর্চা।

### ৮. অর্থনৈতিক বয়কট ও দেশীয় পণ্য ব্যবহার

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত দেশগুলোর পণ্য বর্জন এবং দেশীয় উৎপাদন ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা যেতে পারে।

**করণীয়:**

- স্থানীয় পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।
- বহুজাতিক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত হওয়া।

### ৯. নেতৃত্ব ও প্রতিভা বিকাশ

**উম্মাহর ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির জন্য প্রতিভাবানদের চিহ্নিত করা এবং উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।** প্রতিভা বিকাশের জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

**করণীয়:**

- তরুণদের শিক্ষায় বিনিয়োগ।
- নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে প্রশিক্ষণ।

মুসলিম উম্মাহর জন্য ঐক্য, আত্মশুদ্ধি, এবং কার্যকর নেতৃত্ব গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি প্রস্তাব বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য নিয়ে মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে তাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে।

## নবীদের জীবনী বিকৃতিতে অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র

### ১. নবীদের পবিত্র জীবনীর বিকৃতি

নবীদের জীবনীর বিকৃত উপস্থাপনা ইসলামের প্রতি অবমাননা এবং ইসলামের ঐতিহাসিক সঠিকতা নষ্ট করার প্রচেষ্টা। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও ফিল্ম নির্মাতারা নবীদের জীবনকে বিকৃত ও কল্পনাপ্রসূতভাবে উপস্থাপন করছে, যা মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

**২. ফিল্ম ও মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিকৃতি**

বেশ কিছু টেলিভিশন সিরিয়াল, মুভি ও ড্রামা সিরিজে নবীদের জীবনী ও ইসলামী ইতিহাস বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এসব ফিল্ম ও মিডিয়া প্রোগ্রামে নবীদের চরিত্রের সাথে অশালীনতা, পাপী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাধ্যমে চরিত্র চিত্রায়িত করা হচ্ছে, যা স্পষ্টভাবে ইসলাম ও নবীদের প্রতি অবমাননা।

**৩. ধর্মীয় অবমাননা ও ষড়যন্ত্র**

এধরনের চলচ্চিত্র, সিরিয়াল এবং মিডিয়া কার্যক্রম শুধুমাত্র ধর্মীয় অবমাননা নয়, বরং এটি ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস পরিবর্তন করার একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এসব মুভি ও সিরিয়ালে নবীদের চরিত্রকে বিকৃত করে তুলে ধরা, বিশেষত তাদের পবিত্র চরিত্রের সাথে অশালীনতা এবং ভ্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা, ইসলামি আদর্শের প্রতি গভীর আঘাত।

**৪. উলামা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা**

এ বিষয়ে উলামা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। নবীদের জীবনীর বিকৃত উপস্থাপন রুখে দিতে হবে এবং মুসলিম দেশে এসব ফিল্মের আমদানী ও সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা উচিত।

**৫. প্রতিবাদ ও সচেতনতা সৃষ্টি**

মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যের উচিত এ বিষয়ে প্রতিবাদ করা, সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ইসলাম ও নবীদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের পবিত্র জীবনীর সঠিক উপস্থাপন নিশ্চিত করতে চেষ্টা করা।

মুসলিম উম্মাহকে একসাথে দাঁড়িয়ে নবীদের প্রতি অবমাননার প্রতিবাদে সরব হওয়া । নবীদের পবিত্র জীবনী কিভাবে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সমাজে আন্দোলন সৃষ্টি করা এবং সরকারের কাছে উপযুক্ত পদক্ষেপ দাবি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় অবমাননা রোধ করতে প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হল এই অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

**তথ্যসূত্র:**

**মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী**

## বার্মার আরাকান রাজ্যে রোহিঙ্গা (মুসলিম) জাতির উপর অমুসলিমদের অপতৎপরতা এবং আমাদের কর্তব্য

রোহিঙ্গা জাতি, যাদের নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাষা রয়েছে, তাদেরকে আজ বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মায়ানমারের (পূর্বে বার্মা) আরাকান রাজ্য, যা এখন রাখাইন রাজ্য নামে পরিচিত, একসময় একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। এটি ভূগোল, ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। বর্তমান আরাকান রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা, নির্যাতন এবং গণহত্যার শিকার।

### আরাকানের ভৌগোলিক পরিচিতি ও সংযোগ

আরাকান বা রাখাইন রাজ্য বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী একটি অঞ্চল। এটি ৩৯৮ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে ৬০ থেকে ৩০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বার্মার মূল ভূখণ্ড থেকে এটি সম্পূর্ণভাবে একটি প্রাকৃতিক পর্বতমালা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে আরাকান বাংলাদেশ, বিশেষ করে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার উপকূলীয় অঞ্চলের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতেও রোহিঙ্গা জাতি বার্মিজদের চেয়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছাকাছি।

### আরাকান রাজ্যের ঐতিহাসিক পটভূমি

আরাকান, যা আজ রাখাইন রাজ্য নামে পরিচিত, মায়ানমারের একটি উল্লেখযোগ্য অঞ্চল। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এই রাজ্যটির আয়তন প্রায় ৩৯৮ মাইল দীর্ঘ এবং ৬০-৩০ মাইল প্রশস্ত। এটি ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূলীয় এলাকার সাথে মিল রাখে। বার্মার সাথে এর সরাসরি কোনো প্রাকৃতিক সংযোগ নেই; একটি বিশাল পর্বতমালা এই অঞ্চলকে বার্মা থেকে স্বাভাবিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

আরাকানের জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সাথে বাংলাদেশের নিবিড় সংযোগ রয়েছে। আরাকানবাসীদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে আরব, পারস্য ও ভারতীয় মুসলিম বণিকরা ছিলেন, যারা আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং এভাবেই এই অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে ওঠে। কথিত আছে, আরাকানে জাহাজডুবির সময় আরব মুসলিমরা “রহম রহম” বলে বাঁচার আহ্বান জানায়, যা থেকে স্থানীয়রা তাদের "রোহিঙ্গা" নামে ডাকা শুরু করে।

### বার্মিজ শাসন ও ব্রিটিশ উপনিবেশ

বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) আরাকানকে প্রথম দখল করে ১৭৮৩ সালে। কিন্তু বার্মিজরা দীর্ঘকাল এই অঞ্চল শাসন করতে পারেনি। ১৮২৪ সালে ব্রিটিশরা বার্মা দখল করে নেয়, যা পরবর্তী ১২২ বছর ধরে তাদের উপনিবেশ হিসেবে পরিচিতি পায়। ব্রিটিশ শাসনকালে আরাকানের জনগণকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্ম পালনে তুলনামূলক স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল।

**আরাকান রাজ্য এবং পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা**

১৯৪৮ সালে ব্রিটিশরা বার্মাকে স্বাধীনতা দিলে আরাকানের মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের অঞ্চলকে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ব্রিটিশরা কাশ্মীর সমস্যার মতোই আরাকানকেও বার্মার অধীনে রেখে দেয়, ভবিষ্যতে গণভোটের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯৫৮ সালে এই গণভোট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বার্মার সামরিক শাসক জেনারেল নে উইন এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করেন। ফলে আরাকানের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী শাসনতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

**রোহিঙ্গা জাতির উৎপত্তি ও ইতিহাস**

রোহিঙ্গা জাতির আদি পুরুষরা মূলত আরব বণিক, যারা সপ্তম শতাব্দীতে সমুদ্রপথে আরাকানে এসেছিলেন। একটি কাহিনী অনুসারে, তাদের জাহাজডুবির সময় তারা স্থানীয়দের কাছে "রহম রহম" বলে সাহায্য চেয়েছিলেন। এখান থেকেই "রোহিঙ্গা" নামটি উৎপত্তি লাভ করে বলে ধারণা করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা স্থানীয় নারীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

মোগল আমলে রোহিঙ্গারা মোগল শাসকদের অধীনে থাকলেও, তারা আরাকানের স্থানীয় বৌদ্ধ রাজাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছিল। আরাকানের রাজদরবারে মুসলমান এবং হিন্দুদের সমান কদর ছিল। বাংলা সাহিত্য জগতের প্রখ্যাত কবি আলাওল, দৌলত কাজী এবং সৈয়দ সুলতান আরাকানের দরবারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

**ব্রিটিশ শাসনামলে রোহিঙ্গাদের অবস্থা**

১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বার্মা ও আরাকান রাজ্য এসে পড়ে। তখন আরাকান রাজ্য থেকে লোকজন ব্রিটিশ ভারত, বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসিত হয়। আবার ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী থেকে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র কৃষককে আরাকানে নিয়ে আসে, যাতে জঙ্গলাকীর্ণ এ অঞ্চলকে কৃষিযোগ্য করা যায়।

**রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর নিপীড়নের সূত্রপাত**

স্বাধীনতার পর বার্মা সরকারের অধীনে রোহিঙ্গা জাতির অবস্থার অবনতি ঘটে। বার্মিজ বার্মিজ সামরিক জান্তার শাসনকালে (১৯৬২ থেকে) রোহিঙ্গাদের উপর নিপীড়ন বাড়তে থাকে। ১৯৮২ সালে বার্মিজ সরকার একটি নতুন নাগরিকত্ব আইন পাস করে, যা রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন ঘোষণা করে। শাসকগণ রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের একটি "অবৈধ অভিবাসী" হিসেবে অভিহিত করে। তাদের "বিদেশি" বা "বাঙালি অভিবাসী" হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং নাগরিকত্বের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা

হয়।এরপর থেকে রোহিঙ্গা মুসলিমরা নিয়মিত বার্মিজ সেনাবাহিনীর সামরিক নিপীড়নের শিকার হতে থাকে। লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব এবং পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুসারে, রোহিঙ্গাদের বার্মার নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। এর ফলে তারা শাসন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

**বর্তমান সংকট ও গণহত্যা**

রোহিঙ্গাদের উপর সর্বশেষ ব্যাপক নির্যাতন শুরু হয় ২০১৭ সালে, যখন মায়ানমারের সামরিক বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয় এবং লক্ষাধিক মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়। জাতিসংঘ এই অভিযানকে "গণহত্যা" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

**সাম্প্রতিক সঙ্কট ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া**

২০১৭ সালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতনের মাত্রা চরমে পৌঁছায়। মায়ানমারের সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, ধর্ষণ ও গ্রাম পুড়িয়ে দেয়ার মতো ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত করে। এই নিপীড়ন আন্তর্জাতিকভাবে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। জাতিসংঘের মতে, এই বর্বরতার ফলে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। কক্সবাজারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবির তৈরি হয়। বাংলাদেশের সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

**রোহিঙ্গা সংকট: মানবতার ক্রন্দন**

রোহিঙ্গা ইস্যু বর্তমান বিশ্বের এক জ্বলন্ত মানবিক সংকট। আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমরা বছরের পর বছর ধরে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা এবং উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের নির্মম নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার। তাদের ওপর চালানো হচ্ছে গণহত্যা, ধর্ষণ, এবং নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা। ফলে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে পালিয়ে এসেছে। এ সংকটের প্রকৃত বাস্তবতা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে এটি কেবল একটি জাতিগোষ্ঠীর অধিকার হরণের নয়, বরং বিশ্বব্যাপী মানবিক অনুভূতির ব্যর্থতার একটি করুণ উদাহরণ।

**১. রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নের চিত্র**

**গণহত্যা ও নির্যাতন:**

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এবং উগ্র বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়েছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ২০১৭ সালের অভিযানে কমপক্ষে ২৪ হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়। এর পাশাপাশি নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা, গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া এবং বয়স্কদের নির্মম নির্যাতনের ঘটনা বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছে।

**বাস্তুচ্যুতি:**

৮০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলিম তাদের ঘরবাড়ি হারিয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে এখন বসবাস করছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী জনগোষ্ঠী। এদের মধ্যে অধিকাংশই নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ।

**ধর্ষণ ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা:**

রোহিঙ্গা নারীদের ওপর ব্যাপকভাবে যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে। "মেডিসিন স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স" (MSF)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, অনেক নারী মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ও উগ্র বৌদ্ধদের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিছু নারী নির্যাতনের পরে জীবিত থাকলেও মানসিক এবং শারীরিকভাবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

**২. রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে জীবনযাপন**

বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের জীবনের চিত্র খুবই করুণ।

**অমানবিক পরিবেশ:**

বাংলাদেশের কক্সবাজার শরণার্থী শিবিরগুলোতে রোহিঙ্গারা চরম মানবেতর জীবনযাপন করছে। এসব শিবিরে বসবাসকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, খাবার, এবং বাসস্থানের অভাব প্রকট। বৃষ্টির সময় পানির জন্য ডুবে যাওয়া কিংবা পাহাড়ি ভূমিধসের মতো ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়।

**শিশুদের ভবিষ্যৎ:**

শরণার্থী শিবিরে থাকা শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। তারা মানবেতর পরিস্থিতিতে বেড়ে উঠছে, যা তাদের ভবিষ্যতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

**৩. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা**

**তুরস্ক, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া:**

তুরস্কের ফার্স্ট লেডি সরাসরি বাংলাদেশে এসে রোহিঙ্গাদের জন্য সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া জাহাজ ও বিমানে রিলিফ পাঠিয়েছে। কিন্তু এসব উদ্যোগ সামগ্রিক সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়।

**চীন ও রাশিয়ার ভেটো:**

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব আনার চেষ্টা হলে চীন ও রাশিয়া ভেটো প্রদান করেছে। তাদের এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিশাল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

**ভারতের নির্লিপ্ত ভূমিকা:**

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মিয়ানমার সফরে গিয়ে রোহিঙ্গাদের নিপীড়নের বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে বরং মিয়ানমারের সামরিক সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বের বার্তা দিয়েছেন। এটি ভারতীয় সরকারের নির্লিপ্ততাকে স্পষ্ট করেছে।

**৪. বাংলাদেশের ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা**

বাংলাদেশ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু দেশের অর্থনীতি ও সীমিত সম্পদের কারণে এই শরণার্থীদের দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক সাহায্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু সহযোগিতা আসলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

**৫. ভবিষ্যৎ সমাধানের জন্য প্রস্তাবনা**

**গণভোটের মাধ্যমে আরাকানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ:**

১৯৫৮ সালে মিয়ানমার সরকার আরাকানবাসীদের গণভোটের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন করেনি। আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করে এ গণভোট আয়োজন করা জরুরি।

**আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ:**

জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত মিয়ানমারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা।

**শরণার্থীদের পুনর্বাসন:**

বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বাসস্থান, শিক্ষা, এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তবে এটি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে সম্ভব।

**আমাদের কর্তব্য**

রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্যই ভূমিকা নিতে হবে। এই লক্ষ্যে আমাদের নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া জরুরি:

১. **রোহিঙ্গাদের প্রতি সহমর্মিতা:**

রোহিঙ্গাদের প্রতি আমাদের মানবিক দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের উচিত তাদের জন্য আশ্রয়, খাদ্য এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

২. **আন্তর্জাতিক সচেতনতা বৃদ্ধি:**

বাংলাদেশসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. **দীর্ঘমেয়াদী সমাধান খোঁজা:**

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিরাপদ প্রত্যাবাসন এবং তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

৪. **ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা:**

মুসলিম দেশগুলোর উচিত রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সমস্যা সমাধানে একসঙ্গে কাজ করা।

৫. **আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ:** জাতিসংঘ, ওআইসি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে মায়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টি করে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে হবে।

৬. **শরণার্থী শিবিরে মানবিক সহায়তা:** রোহিঙ্গা শরণার্থীদের খাদ্য, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৭. **রোহিঙ্গা সংস্কৃতি রক্ষা:** রোহিঙ্গাদের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

৮. **মায়ানমারের সেনাবাহিনীর জবাবদিহিতা:** মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের উদ্যোগ নেয়া জরুরি।

**জাতীয়ভাবে আমাদের করণীয়: বিস্তারিত বিশ্লেষণ**

রোহিঙ্গা সংকট শুধু একটি আঞ্চলিক মানবিক সমস্যা নয়; এটি আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ধর্মীয় স্বার্থ, এবং জাতিগত উত্তেজনার মিশ্রণ। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্ব কেবল সীমাবদ্ধ মানবিক সাহায্যের মধ্যে নয়; বরং এর চেয়ে বেশি কার্যকর, সুদূরপ্রসারী এবং কৌশলগত পরিকল্পনার মধ্যে নিহিত। এ সংকট শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো বিশ্বব্যবস্থার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয়ভাবে আমাদের কী কী করণীয় থাকতে পারে, তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

**১. জাতীয় সম্মেলন আয়োজন**

রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে একটি জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা এখন সময়ের দাবি। এ সম্মেলনে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো, নাগরিক সমাজ, বুদ্ধিজীবী, এবং প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি হবে একটি দল-মত নির্বিশেষে জাতীয় ইস্যু। এখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে:

সমস্যার প্রকৃতি ও সম্ভাব্য সমাধান।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দাবি পেশের রূপরেখা।

মানবিক ও কূটনৈতিকভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

**২. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা**

বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করাতে হবে। এটি একদিকে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে সহায়ক হবে, অন্যদিকে তাদের নিজ নিজ সরকারকে বাস্তব অবস্থা জানাতে তাগিদ দেবে। এর মাধ্যমে:

মায়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাবে।
মানবিক সহায়তার জন্য বৈশ্বিক তহবিল সংগ্রহ সহজ হবে।

**৩. রোহিঙ্গা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন**

পাকিস্তানের কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতো, বাংলাদেশেও একটি রোহিঙ্গা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মন্ত্রণালয়টি কেবল মানবিক সহায়তা নয়, বরং কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমাধানেও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্যই অরাজনৈতিক এবং দক্ষ হতে হবে।
এটি রোহিঙ্গাদের পক্ষে জাতিসংঘ, ওআইসি এবং আন্তর্জাতিক আদালতে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

**৪. সামরিক প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ**

মায়ানমারের হেলিকপ্টার আমাদের সীমান্ত আকাশসীমা লঙ্ঘন করে যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে, তা প্রতিহত করার জন্য সীমান্ত এলাকায় সামরিক মহড়া আয়োজন করতে হবে।

সীমান্ত রক্ষায় স্থায়ী কৌশলগত পরিকল্পনা।
সীমান্তে স্থলমাইন প্রতিরোধ এবং নিরাপত্তা জোরদার।
দেশের সামরিক সক্ষমতার প্রদর্শন, যা শত্রুদের নিরুৎসাহিত করবে।

**৫. আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শক্ত অবস্থান**

জাতিসংঘ এবং ওআইসির সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা সমস্যার মানবিক ও নৈতিক দিকগুলো তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি মায়ানমার সরকারের মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনতে হবে।

কূটনৈতিকভাবে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে রাশিয়া ও চীন ভেটো প্রয়োগ না করে।
বন্ধুপ্রতীম মুসলিম দেশগুলোর সমর্থন আদায় করতে হবে।

**৬. রোহিঙ্গা যুবকদের সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হওয়া ঠেকানো**

যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা জাতিসংঘ সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়, তবে রোহিঙ্গা যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এটি ভবিষ্যতে আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে।

তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে।

কুটির শিল্প ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে।

**৭. ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক যুক্তি উপস্থাপন**

মায়ানমার সরকার যদি ধর্মীয় বা নৃতাত্ত্বিক কারণে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের অযোগ্য মনে করে, তাহলে একই যুক্তিতে বাংলাদেশেও বসবাসকারী মগ জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্বের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

মায়ানমারের নিকট এ যুক্তি তুলে ধরে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।
রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত না করলে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মগদের বিষয়ে সমুচিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানাতে হবে।

**৮. ত্রাণ শিবিরে নারীদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা**

রোহিঙ্গা ত্রাণ শিবিরে বসবাসরত নারীদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য তাদেরকে কুটির শিল্প বা ছোট ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

যুবকদের জন্য কারিগরি শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দায়িত্বশীল ও স্বনির্ভর করার মাধ্যমে তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা যাবে।

**৯. মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ**

মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো যদি জাতিসংঘে যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়, তবে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসংঘ গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে।

মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক শক্তি, বিশেষ করে তেল সরবরাহ বন্ধ করার মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**১০. কূটনৈতিক সমঝোতা**

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী মগ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সম্পর্কের বিষয়টি মায়ানমারের সঙ্গে কূটনৈতিক সমঝোতার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।

রোহিঙ্গা সমস্যা কেবল মানবিক সংকট নয়; এটি একটি জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। এ সংকট নিরসনে শুধু সহানুভূতির মনোভাব যথেষ্ট নয়; দরকার কার্যকর পদক্ষেপ এবং সুনির্দিষ্ট কৌশল। বাংলাদেশকে এখনই কূটনৈতিক, সামরিক এবং মানবিক উদ্যোগের সমন্বয়ে শক্তিশালী নেতৃত্বের উদাহরণ স্থাপন করতে হবে।

আমরা যদি নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি, তবে এই সংকট বাংলাদেশের জন্য একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে একটি মহৎ নেতৃত্ব প্রদর্শনের সুযোগ হিসেবেও প্রমাণিত হবে।

**উৎস**

১. ইউনাইটেড ন্যাশনস (UN) রোহিঙ্গা সংক্রান্ত রিপোর্ট।

২. ইতিহাসবিদদের প্রবন্ধ ও গবেষণা।

৩. রোহিঙ্গা অভিবাসন এবং তাদের ইতিহাস নিয়ে প্রকাশিত পুস্তক।

**তথ্যসূত্র:**

1. মায়ানমারের ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক গবেষণা নিবন্ধ।
2. জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (UNHCR) রিপোর্ট।
3. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন।

**উৎস:**

- জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রতিবেদন, ২০১৭
- আল জাজিরা নিউজ আর্কাইভ, ২০১৭
- মেডিসিন স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স (MSF) প্রতিবেদন
- রয়টার্স, ২০১৭
- তুরস্কের রেড ক্রিসেন্ট রিপোর্ট

তথ্যসূত্র:

১. বুখারী শরীফ: হাদিস নম্বর ৩৪৮৪।

২. রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন।

৩. জাতিসংঘ এবং ওআইসির সাম্প্রতিক বিবৃতি।

৪. আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের তথ্য।

## শান্তি, সম্প্রীতি ও উদারতার ধর্ম ইসলাম

ইসলাম শব্দটির উৎপত্তি "সালাম" ধাতু থেকে, যার অর্থ শান্তি। যে ধর্মের নামই শান্তির প্রতীক, সেই ধর্মকে সন্ত্রাসের সাথে জড়ানো মানে চরম বিভ্রান্তি এবং অবিচার। ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা, গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায়, ইসলাম সন্ত্রাস নয়, বরং শান্তি, সম্প্রীতি এবং উদারতার বার্তা বহন করে। বর্তমান বিশ্বে ইসলাম এবং মুসলমানদের সন্ত্রাসের সাথে জড়িত করার অপপ্রচার মূলত পাশ্চাত্য মিডিয়া এবং ইহুদী-খ্রিস্টান চক্রের ষড়যন্ত্রের ফল। বিভিন্ন ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে

মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় যাতে বিশ্ব জনমতের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এর পেছনে রয়েছে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ ষড়যন্ত্র। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা ছাড়া সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

**ইসলামে শান্তি ও সম্প্রীতি**

ইসলামের নামই "শান্তি," যার মাধ্যমে মানব জাতিকে শান্তি ও সম্প্রীতির পথ দেখানো হয়েছে। **রাসূলুল্লাহ (সা.)** বলেছেন,

*"মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত এবং জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"*
*(সহিহ বুখারি: ১০)*

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করেছেন। **মদিনার সনদ** এর অন্যতম উদাহরণ, যেখানে তিনি মুসলিম, ইহুদি এবং মুশরিকদের সাথে শান্তি ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে একটি সমন্বিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

**সন্ত্রাস: সংজ্ঞা ও প্রকৃতি**

**সন্ত্রাস কী?**

সন্ত্রাসের সংজ্ঞা বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। **এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা** সন্ত্রাসকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করে:

*"Terrorism, the systematic use of terror or unpredictable violence against governments, publics or individuals to attain a political objective."*

অর্থাৎ, সন্ত্রাস হলো কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র, জনগণ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবৈধভাবে হিংস্র কর্মকাণ্ড পরিচালনা।

**প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রব** তার "সন্ত্রাস: গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিপন্থী" প্রবন্ধে বলেছেন,

*"যে কর্মকাণ্ড সমাজ, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়ে জীবন, সম্পদ ও শান্তির জন্য হুমকি তৈরি করে, তা সন্ত্রাস।"*

তবে সমস্যার মূল দেখা যায় সংজ্ঞা নয়, বরং এর প্রয়োগে। একই কাজকে কেউ নিন্দিত করে, আবার কেউ নন্দিত করে। কেউ সন্ত্রাসীকে ঘৃণা করে, কেউ তাকে বীর হিসেবে আখ্যায়িত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ফলে সন্ত্রাসের প্রকৃত চিত্র অনেক সময় বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে।

ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ জীবনধারা, যা সব ধরনের সহিংসতা ও সন্ত্রাসকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে। **পবিত্র কুরআনে** আল্লাহ বলেছেন,

*“যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করে, সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করল।”*
*(সূরা মায়েদা: ৩২)*
এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে, ইসলামে নিরপরাধ মানুষ হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলাম সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় না; বরং তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।

**সন্ত্রাস: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি**

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা সর্বদা ন্যায়, শান্তি ও মানবিকতার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। ইসলাম স্পষ্টতই সন্ত্রাস ও অশান্তির বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করে। ইসলামের বিধানে এমন কোনো অনুমোদন নেই যা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার দিকে ইঙ্গিত করে। আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, অন্যায়ভাবে দেশ হতে বহিষ্কার, ধর্মীয় ফেতনা সৃষ্টি, চুরি-ডাকাতি, লুটতরাজ, খুন, ধর্ষণ এবং সম্ভ্রমহানির মতো কর্মকাণ্ড ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং জঘন্য পাপ হিসেবে বিবেচিত।

কুরআন ও হাদীসে সন্ত্রাস ও জুলুমের বিরুদ্ধে বহু নির্দেশনা এসেছে। আল্লাহ বলেন:
**"যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং এতে বক্রতা খোঁজে, তারাই আখিরাত সম্পর্কে অবিশ্বাসী।"**
*(সূরা আ'রাফ: ৪৫)*
অন্যত্র তিনি বলেন:
**"তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"**
*(সূরা নিসা: ২৯)*
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে কোনো মানুষ হত্যা করা সম্পর্কে কুরআন ঘোষণা করেছে:
**"যে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, সে যেন পুরো মানবজাতিকেই হত্যা করল।"**
*(সূরা মাইদা: ৩২)*

**জিহাদ বনাম সন্ত্রাস**

ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করার জন্য অনেকেই ভুলভাবে জিহাদের ধারণা উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, **জিহাদ** একটি আরবি শব্দ যার অর্থ **"পরিশ্রম করা"** বা **"সংগ্রাম করা"**। এটি কোনোভাবেই সন্ত্রাস বা নিরীহ মানুষ হত্যার সমার্থক নয়। বরং জিহাদ হলো ন্যায় ও মানবিকতার পক্ষে সংগ্রাম এবং সমাজ থেকে অন্যায় দূর করার একটি পবিত্র প্রচেষ্টা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
**"তোমার ভাই জালেম হোক বা মজলুম, তার সাহায্য করো।"**

সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "মজলুম হলে তো সাহায্য করবো, কিন্তু জালেম হলে কীভাবে সাহায্য করবো?"
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন:
**"তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখো। এটিই তার প্রতি সাহায্য।"** *(বুখারী: ৬৯৫২)*
ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস একটি জঘন্য অপরাধ যা ব্যক্তির নৈতিকতা এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অভাবের ফল। কুরআন এবং হাদীসের আলোকে দেখা যায়, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ও সুবিচারপূর্ণ সমাজ গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এই সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গঠনে ইসলাম শুধু শান্তি প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের চিন্তা-চেতনাকে খোদাভীতি ও পরকালীন জবাবদিহিতার মাধ্যমে উন্নত করারও নির্দেশনা দিয়েছে। এজন্যই ইসলামের সঠিক চর্চা একবিংশ শতাব্দীর সন্ত্রাসমুক্ত পৃথিবীর জন্য একমাত্র উপায়।

**১. জিহাদের প্রকৃত অর্থ**

জিহাদ মানে কোনো অযথা যুদ্ধ বা সহিংসতা নয়। বরং, এটি অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার একটি পন্থা।

- **কুরআনের প্রমাণ**:
    - *সূরা হজ্জ: ৩৯:* যুদ্ধের অনুমতি তখনই দেওয়া হয় যখন মুসলমানরা অত্যাচারের শিকার হয়।
    - *সূরা আনফাল: ৩৯:* ফেতনা (অরাজকতা) দূর করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের লক্ষ্য।
      জিহাদ শুধু নির্যাতিতের রক্ষার জন্য, এবং এটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বৈধ।

**২. জিহাদ বনাম সন্ত্রাস**

জিহাদকে সন্ত্রাসের সঙ্গে মেলানো একটি ভুল ধারণা। লেখায় বলা হয়েছে:

- জিহাদ কখনোই গণহত্যা, গণধর্ষণ, বা অন্যায় দখল নয়।
- এটি মানবাধিকার রক্ষা করে এবং উপাসনালয়গুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে (সূরা হজ্জ: ৪০)।
- জিহাদ জালিমের বিরুদ্ধে, নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে নয়।

**৩. ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা**

ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম।

- মহানবী (সা.) যুদ্ধে নারী, শিশু, এবং নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।
- বন্দীদের প্রতি ইসলামের আচরণ অত্যন্ত মানবিক ছিল।
    - বদরের যুদ্ধের পর বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার শর্ত ছিল শিক্ষাদান।

    ○ হুনাইনের যুদ্ধে বন্দীদের মুক্তি দিয়ে মহানুভবতা দেখানো হয়।

**৪. ইসলামের ইতিহাসে শান্তি প্রতিষ্ঠা**

ইসলামের আবির্ভাবের আগে বিশ্বব্যাপী হিংস্রতা, অন্যায়, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চলমান ছিল।

- ইসলাম সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে মানবতার মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে।
- মহানবী (সা.)-এর প্রচেষ্টা এবং ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে বর্বরতাপূর্ণ সমাজগুলো শান্তিপূর্ণ সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

**৫. অন্য ধর্ম ও ইসলামের সহাবস্থান**

ইসলামের লক্ষ্য অন্য ধর্ম বা জনগোষ্ঠীকে দমন করা নয়। বরং:

- সবাইকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করা।
- মানবজাতির সমতার বার্তা প্রচার করা (সূরা হুজুরাত: ১৩)।

**৬. ইসলাম ও তথাকথিত শান্তিবাদীদের দ্বিমুখী আচরণ**

লেখায় পশ্চিমা শক্তিগুলোর (যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, ইসরায়েল) কার্যক্রমকে ধর্মীয় সহিংসতার প্রকৃত উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

- মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সন্ত্রাস বলে প্রচার করা হয়, যা বৈষম্যমূলক ও অবিচার।

**৭. শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি**

ইসলামের মূল লক্ষ্য পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

- *বুখারী: ৬১১৯:* প্রকৃত মুসলমান সেই যে অন্যের ক্ষতি করে না।
- ইসলাম সাম্যের বার্তা দেয় এবং অন্য ধর্ম ও মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেখায়।

**সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য:**

- সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির ঘটনাগুলো, যেমন একটি বকরির মাথা সাত ঘর ঘুরে আবার প্রথম জনের নিকট ফিরে আসা, উদারতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- ইসলাম প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দেয় এবং প্রতিবেশীদের প্রতি অবহেলা ঈমানের অভাব বলে চিহ্নিত করেছে।

**অমুসলিমদের প্রতি উদারতা:**

- মদীনা সনদ, সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং তাদের প্রতি মহানুভবতা ইসলামি শিক্ষার অনন্য উদাহরণ।
- নবীজীর নিজের উদাহরণ—যেমন, ইহুদী ঋণদাতার প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ।

**সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা:**

- তায়েফের ঘটনা: নবীজীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ সত্ত্বেও তিনি তাদের জন্য বদ-দোয়া করেননি বরং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হেদায়াতের জন্য দোয়া করেছেন।

- হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং আবু জান্দালের ঘটনা: শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ধৈর্য ধারণ এবং সহিষ্ণু আচরণ।
- মক্কার পুনরুদ্ধারের সময়ের দয়ার উদাহরণ।

**ইসলামের শিক্ষা:**

- কুরআনের নির্দেশনা: ধৈর্য ধারণ ও ক্ষমা ইসলামের মহৎ গুণাবলির মধ্যে অন্যতম।
- হাদিসের শিক্ষা: ক্রোধ দমন এবং উদারতা চর্চার গুরুত্ব।

**ইতিহাসের উদাহরণ:**

- সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর উদারতা ও ইসলামের উদার নীতি।
- ক্রুসেডারদের নির্দয় আচরণের তুলনায় মুসলিমদের উদারতা।

**সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান**

ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। **পবিত্র কুরআনে** আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন,

*"পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।"*
*(সূরা আল-বাকারা: ২০৫)*

ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা প্রতিটি মুসলমানের অধিকার, তবে তা ন্যায়বিচারের সীমানার মধ্যে থেকে হতে হবে। কোনোভাবেই নিরপরাধ মানুষ বা সম্পদের ক্ষতি করার অনুমতি ইসলাম দেয় না।

**ইসলামের উদারতা**

ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়; বরং সারা বিশ্বের জন্য শান্তি ও কল্যাণের বার্তা বহন করে। **রাসূলুল্লাহ (সা.)** বলেছেন,

*"তোমরা সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসো, যে নিজের জন্য যা চায়, তা অন্যের জন্যও চায়।"*
*(সহিহ মুসলিম: ৪৫)*

ইসলামের উদারতার আরেকটি উদাহরণ হলো যুদ্ধের ক্ষেত্রে নীতি। যুদ্ধের সময়ও ইসলাম নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং নিরপরাধদের হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

**ইসলামের সহিষ্ণুতা**

ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। **কুরআনে** বলা হয়েছে,
*"তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আমাদের ধর্ম আমাদের জন্য।"*
*(সূরা কাফিরুন: ৬)*

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় তার সমস্ত শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এটি ইসলামের উদারতা এবং সহিষ্ণুতার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ জীবনধারা এবং মানব জাতির কল্যাণে নিবেদিত একটি আদর্শ। সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামের শিক্ষার মর্মার্থই হলো, শান্তি, সম্প্রীতি এবং উদারতা।

যারা ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত করে, তারা হয় ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, নয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়। মুসলমানদের উচিত তাদের ধর্মের প্রকৃত বার্তাটি সঠিকভাবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা।

**রেফারেন্স**

১. পবিত্র কুরআন।

২. সহিহ বুখারি।

৩. সহিহ মুসলিম।

৪. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।

৫. "সন্ত্রাস: গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিপন্থী," প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রব।

**সন্ত্রাস নির্মূলে ইসলামের ভূমিকা**

ইসলাম সন্ত্রাস নির্মূলে শুরু থেকেই কার্যকরী ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুধু অপরাধ দমন নয়, ইসলামের শাসনব্যবস্থা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাকেও নষ্ট করে দেয়। জন্ম থেকে শুরু করে প্রতিটি মানুষের মন ও হৃদয়কে নৈতিক শিক্ষা ও আল্লাহভীতির দ্বারা পরিশুদ্ধ করার উপর গুরুত্ব দেয় ইসলাম।

**নবজাতককে সঠিক পথে পরিচালিত করার ব্যবস্থা:**

১. **গর্ভকালীন সতর্কতা:** শিশুর জন্মের আগে থেকেই মাতা-পিতাকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে বলা হয়েছে যা শিশুতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

২. **আযান-ইকামত:** ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই নবজাতকের কানে আযান-ইকামত শোনানোর মাধ্যমে তাকে সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের বার্তা দেওয়া হয়।

৩. **সুন্দর নামকরণ:** শিশুর নাম রাখার সময়ও ইসলাম পরামর্শ দিয়েছে যাতে তার মধ্যে আল্লাহভীতি ও নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটে।

৪. **নৈতিক শিক্ষা ও সুশিক্ষা:** পিতামাতার দায়িত্ব সন্তানকে উত্তম চরিত্র, আদর্শ নৈতিকতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করা। হাদিসে এসেছে:

**"পিতার তিনটি দায়িত্ব: সুন্দর নাম রাখা, প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয়া এবং উপযুক্ত বয়সে তার বিবাহের ব্যবস্থা করা।"**

*(শু'আবুল ঈমান: ৮৬৬৬)*

**শাস্তির বিধান: সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের কঠোরতা**

ইসলামে সন্ত্রাস, খুন, লুটতরাজ এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

- **খুনের শাস্তি:** খুনের জন্য কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। **"নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস তথা মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়া হলো।"** *(সূরা বাকারা: ১৭৮)*
- **ব্যভিচারের শাস্তি:** প্রমাণিত হলে ১০০ বেত্রাঘাত বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। *(সূরা নূর: ২)*
- **চুরির শাস্তি:** **"চোর নারী হোক বা পুরুষ, তার হাত কেটে দাও।"** *(সূরা মাইদা: ৩৮)*
- **লুটতরাজের শাস্তি:** **"যারা লুটতরাজ করে, তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দাও বা শূলিতে চড়াও।"** *(সূরা মাইদা: ৩৩)*

এই শাস্তিগুলো অপরাধীকে দমন করার পাশাপাশি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে।

**তথ্যসূত্র:**

**মাওলানা মুহাম্মদ আবু সাইম**

### সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে ইসলামের নির্দেশনা

মানুষ সামাজিক জীব। প্রতিদিনের জীবনযাপনে একে অন্যের সঙ্গে চলাফেরা, কথা বলা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সমাজে বসবাস অসম্ভব। আর এই পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর ও কল্যাণকর করতে ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা সর্বজনীন। ইসলাম কেবল ইবাদত-বন্দেগিতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও ইসলামের দৃষ্টিতে সাজানো হয়েছে। সামাজিক সম্পর্কের মূলভিত্তি হলো, হাসিমুখ, নম্রতা এবং উত্তম আচরণ। এই গুণাবলিগুলো মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয় এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে।মানুষ প্রকৃতিগতভাবে একটি সামাজিক জীব। তার জীবন যাপন একাকীত্বে পূর্ণতা পায় না। প্রতিদিনের জীবনে মানুষকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, এমনকি মুসলিম-অমুসলিম সকলের সঙ্গে বসবাসের সময়ে মানুষের মধ্যে সুন্দর আচরণ এবং সদাচারের প্রয়োজন হয়। ইসলামের অন্যতম দিকনির্দেশনা হলো, মানুষের সঙ্গে উত্তম সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা। এই উত্তম আচরণের মাধ্যমেই ইসলামের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে এবং এটি ইসলামের প্রতি অমুসলিমদের আকর্ষণ বাড়ানোর অন্যতম মাধ্যম।

**ইসলামে সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের পদ্ধতি**

ইসলামের দাওয়াত দানের পদ্ধতি মূলত দুই ধরনের:

1. **সাউন্ড দাওয়াত:** মুখের কথার মাধ্যমে সরাসরি ইসলামের দাওয়াত দেওয়া।
2. **সাইলেন্ট দাওয়াত:** চারিত্রিক গুণাবলি, সুন্দর আচরণ ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে দাওয়াত।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, মানুষের আচরণ ও মানবিক গুণাবলি, বিশেষ করে মুসলিমদের চরিত্র, হলো সবচেয়ে শক্তিশালী সাইলেন্ট দাওয়াতের মাধ্যম। এটি অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের প্রতি গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

**সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের মৌলিক নীতিমালা**

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাই সমাজে যেকোনো ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশনা ও শক্তিশালী নীতিমালা রয়েছে। এই নীতিগুলো শুধু মুসলমানদের মধ্যেই নয়, অমুসলিমদের সঙ্গেও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক তিনটি নীতিমালা হলো:

**১. হাসিমুখ থাকা:**

হাসিমুখ থাকা মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে এবং সম্পর্ককে মধুর করে তোলে। এটি সামাজিক সৌন্দর্যের অন্যতম প্রকাশ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা সদকা স্বরূপ।" *(তিরমিজি: ১৯৭০)*

**২. অন্যের কষ্ট অনুভব করা:**

ইসলামের শিক্ষা হলো, একজন মুসলমান অন্য মুসলমান বা মানুষের জন্য সে রকম অনুভূতিশীল হবে, যেমন নিজের জন্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তা তার ভাইয়ের জন্যও ভালোবাসে।" *(সহীহ বুখারী: ১৩)*

**৩. অন্যের প্রতি সহনশীল ও উদার হওয়া:**

সামাজিক জীবনে মানুষের সঙ্গে সংঘাত বা মতবিরোধ হতে পারে। ইসলামের শিক্ষা হলো, এমন অবস্থায় সহনশীল ও উদার মনোভাব প্রদর্শন করা। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

**"ক্ষমা করো এবং ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারীদের ভালোবাসেন।"** *(সূরা তাগাবুন: ১৪)*

**প্রথম মূলনীতি: সর্বত্র হাসিমুখ থাকা**

**হাসিমুখের গুরুত্ব**

হাসিমুখ থাকা মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে এবং সম্পর্ককে মধুর করে তোলে। এটি সামাজিক সৌন্দর্যের অন্যতম প্রকাশ। মানুষের জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করতে একটি

মুচকি হাসি অনেক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। এটি মনোমালিন্য দূর করে এবং সম্পর্ককে আরো মধুর করে তোলে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

**"তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা সদকা স্বরূপ।"** *(তিরমিজি: ১৯৭০)*

সুতরাং, একটি ছোট মুচকি হাসি মানুষের অন্তর জয় করতে পারে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা বাড়ায়।

**হাসিমুখের প্রভাব**

মুচকি হাসি শুধু সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, এটি মানুষের হৃদয়গ্রাহী। যদি আপনি মুচকি হেসে কথা বলেন আর না হেসে কথা বলেন, তাহলে পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ:

1. **বিক্রেতা-ক্রেতা সম্পর্ক:** বিক্রেতা যদি হাসিমুখে কথা বলেন, তাহলে ক্রেতা সন্তুষ্টি পায় এবং আবার আসার আগ্রহ প্রকাশ করে।
2. **শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক:** শিক্ষকের হাসিমুখ ছাত্রকে শেখার প্রতি উৎসাহী করে তোলে।
3. **স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক:** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি হাসিমুখে কথা বলা হয়, তাহলে পরিবারে সুখ-শান্তি বিরাজ করে।

**অভ্যাসে পরিণত করা**

যদি আপনার কোনো কারণে স্বাভাবিকভাবে হাসতে সমস্যা হয়, তবে কৃত্রিমভাবে হলেও চেষ্টা করুন। এক সময় এটি অভ্যাসে পরিণত হবে এবং এমনকি শত্রুর সঙ্গেও মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্ভব হবে।

**হাসিমুখে কথা বলা: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত**

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা মুচকি হাসতেন। তিনি আপন-পর, বন্ধু-শত্রু সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস ইবনে জাযয়ি (রাযি.) বলেন:

*"আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বেশি মুচকি হাসতে আমি কাউকে দেখিনি।"* (তিরমিযী : ৩৬৪১)

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন:

*"রাসূল ﷺ যখনই আমার চেহারার দিকে তাকাতেন, মুচকি হাসতেন।"* (তিরমিযী : ৩৮২১)

তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযি.)-কে বলেছেন:

*"তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলবে। এটাও নেকির কাজ।"* (আবু দাউদ : ৪০৮৪)

**রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপরূপ সৌন্দর্য ও হাসি**

হযরত জাবির ইবনু সামুরা (রাযি.) বলেন:

*"এক জোছনা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাকালাম। আমি তার চেহারা ও চাঁদের*

*দিকে তাকাতে থাকলাম। তার চেহারাকে চাঁদের চেয়েও সুন্দর মনে হল।"* (তিরমিযী : ২৮১১)

চাঁদের সঙ্গে তুলনা করলেও তা যথেষ্ট নয়। কারণ চাঁদের গায়ে দাগ আছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় কোনো ত্রুটি ছিল না।

**মানব হৃদয়ের চাবি: মুচকি হাসি**

বড়রা বলে থাকেন, "মানুষের হৃদয়ের একটি তালা আছে, আর তা খোলার চাবি হলো মুচকি হাসি।" আপনি যত বেশি হাসিমুখে থাকবেন, তত বেশি মানুষের হৃদয় জয় করতে পারবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

*"তোমরা ধন-সম্পদ দিয়ে লোকদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের চেহারার প্রফুল্লতা এবং চরিত্রের মাধুর্য দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে।"* (বুলুগুল মারাম : ১৫৩৪)

**হাসিমুখ: সহজ সাদকা**

অন্যের সঙ্গে মুচকি হেসে কথা বলা একটি সহজ সাদকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

*"তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা তোমার জন্য সাদকা।"* (তিরমিযী : ১৯৫৬)

**একটি মুচকি হাসি**

*"একটি মুচকি হাসি দেখতে সুন্দর, এতে পয়সা খরচ হয় না। এটি এমন একটি সম্পদ, যা কখনো ফুরাবে না। হাসি এমন এক শক্তি, যা জীবনের উত্থান-পতনে সহজ করে তোলে।"*

তাহলে আসুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের অনুসরণে সর্বদা হাসিমুখে থাকি এবং অন্যদের জন্যও এ শিক্ষা প্রচার করি।

**চেহারা: মনের আয়না**

ইংরেজিতে একটি প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে, *"Face is the index of the mind"*, যার অর্থ চেহারা হলো মনের আয়না। আপনার চেহারার অভিব্যক্তি বলে দেবে আপনি কেমন মানুষ—ভদ্র নাকি অভদ্র। এ জন্যই আমরা অনেক সময় বলি, "চেহারা দেখেই বুঝে গিয়েছি লোকটা কেমন।"

**ফেসবুকে অভিব্যক্তি: ডিজিটাল যুগের আয়না**

আজকের যুগে, আমরা এই কথাটিকে আরেকভাবে বলতে পারি, *"Facebook is the index of the mind"*, অর্থাৎ ফেসবুকই আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। আমরা ফেসবুকে ইমোজি বা রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি। এমনকি, অযথা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য বা 'হা হা' রিঅ্যাক্ট দেওয়া অনেক সময় বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের শিক্ষা হলো, যদি কারো কথা যুক্তিহীন হয়, তা হলে সুন্দরভাবে তা খণ্ডন করা উচিত। আর তা সম্ভব না হলে তাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। বিদ্রূপ করে নিজের আমল নষ্ট করা কখনোই উচিত নয়।

**দ্বিতীয় মূলনীতি: নম্রভাবে কথা বলা**

কথাবার্তার ক্ষেত্রে নম্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

**"আর তোমরা মানুষের সঙ্গে উত্তমভাবে কথা বলবে।"** *(সূরা বাকারা: ৮৩)*

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, শুধু মুসলিম নয়, অমুসলিমদের সঙ্গেও উত্তম ও নম্রভাবে কথা বলা উচিত। ইসলামের শত্রুদের সঙ্গেও নম্রতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**সুন্দর কথা বলার ফায়দা**

সুন্দর কথা মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে এবং পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

**"সুন্দর কথা বলা সদকা স্বরূপ।"** *(মুসলিম: ১০০৯)*

সুন্দর কথার মাধ্যমে অনেক বড় সমস্যার সমাধান সম্ভব, যা কঠোর ও তিক্ত কথায় অসম্ভব।

**মন্দ কথা থেকে বাঁচা**

মন্দ কথা বা অশালীন ভাষা ব্যবহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অশান্তি ডেকে আনে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

**"মুমিন কখনো গালি-গালাজকারী, অভিশাপকারী কিংবা অশালীন কথাবার্তার অভ্যাসকারী হতে পারে না।"** *(তিরমিজি: ১৯৭৭)*

**মুসলমানের ছয়টি হক**

একজন মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের ছয়টি মৌলিক অধিকার রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

**"এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে।"**

১. দেখা হলে সালাম করা।
২. দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করা।
৩. পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ দেওয়া।
৪. হাঁচি দিলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।
৫. অসুস্থ হলে তার খবর নেওয়া।
৬. মৃত্যু হলে তার জানাজায় অংশগ্রহণ করা। *(সহীহ মুসলিম: ২১৬২)*

**সকল মানুষের সঙ্গে সদাচারণ: ইসলামের প্রথম নীতিমালা**

ভালো কিংবা মন্দ, মুসলিম কিংবা অমুসলিম নির্বিশেষে, মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, চলাফেরা এবং কথোপকথনের ক্ষেত্রে ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হল— তোমার চেহারা যেন সবসময় হাস্যোজ্জ্বল থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاس

*"মানুষের জন্য নিজের গাল ফুলিয়ে রেখো না।"* (সূরা লুকমান : ১৮)

এখানে চেহারার অভিব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। কেউ যেন রাগান্বিত বা গোমড়া মুখে কথা না বলে। বরং মানুষের সঙ্গে দেখা হলে বা কথা বললে সর্বদা হাসিমুখে হওয়া উচিত।

**সবার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা**

ইসলামের শিক্ষা হলো, সব মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করা। এমনকি বিরোধীদের সঙ্গেও নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ রয়েছে। ফেরাউন ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ শাসক। তবুও আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.) এবং হারূন (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন:

**"তোমরা তার সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলো।"** *(সূরা ত্বহা: ৪৪)*

সুতরাং আমাদের উচিত, পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী, কর্মক্ষেত্রের সহকর্মী এবং শত্রুদের সঙ্গেও উত্তম ভাষায় কথা বলা।

**অমুসলিমদের সঙ্গে উত্তম আচরণ**

ইসলাম শুধু মুসলমানদের মধ্যেই নয়, বরং অমুসলিমদের সঙ্গেও উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে:

**"তোমরা তাদের প্রতি সদয় ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করো যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।"** *(সূরা মুমতাহিনা: ৮)*

রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধেও সর্বদা উত্তম আচরণ দেখিয়েছেন, এমনকি তারা তার প্রতি বিভিন্ন সময়ে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল। তার চরিত্রের মহান গুণাবলি দেখেই অনেকে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

ইসলামের সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের নির্দেশনা একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা। এটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও মানবতার বোধ জাগিয়ে তোলে। ইসলামের সৌন্দর্য শুধু কথার মাধ্যমে নয়, কাজের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। একজন মুসলিম যখন তার চারিত্রিক গুণাবলির মাধ্যমে মানুষের প্রতি সদাচরণ করে, তখন তা ইসলামের প্রতি অমুসলিমদের আকর্ষণ বাড়ায়।

সুতরাং, আমাদের উচিত ইসলামের নির্দেশিত নীতিমালা মেনে চলা এবং সমাজে শান্তি, ভালোবাসা ও সহানুভূতির পরিবেশ তৈরি করা। ইসলাম অমুসলিমদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ এবং তাদের অধিকার রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে:

**"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।"** *(সূরা মুমতাহিনা: ৮)*

অমুসলিমদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য বা গালি দেওয়া ইসলামের আদর্শের পরিপন্থী।

**পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়**

একবার আবু দারদা (রা.) দেখলেন, একদল লোক অপরাধীকে গালি দিচ্ছে। তিনি বললেন: **"তোমরা তাকে গালি দিও না, বরং তাকে উপদেশ দাও। আল্লাহর প্রশংসা করো, যিনি তোমাদেরকে তার মতো অপরাধ থেকে রক্ষা করেছেন।"** *(মাওসূআতুল আখলাক: ১/৩৮৬)*

**তথ্যসূত্র:**

- কুরআন: সূরা লুকমান : ১৮
- তিরমিযী শরীফ: হাদীস নং ৩৬৪১, ৩৮২১, ২৮১১
- আবু দাউদ: হাদীস নং ৪০৮৪
- বুলুগুল মারাম: হাদীস নং ১৫৩৪
- তিরমিযী: হাদীস নং ১৯৫৬

ইসলামের নির্দেশিত হাসিমুখ, নম্রতা এবং সুন্দর আচরণ সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের মেরুদণ্ড। এটি মানুষের হৃদয়ে শান্তি ও ভালোবাসার আবহ তৈরি করে। একজন মুসলিম যখন এই গুণাবলি অর্জন করে, তখন এটি তার ইবাদতের অংশ হয়ে যায়। আমাদের উচিত এই নীতিমালাগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করা।

**মানবিকতা, আদব ও পরমত সহিষ্ণুতা: একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা**

মানবিকতা, আদব এবং পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামের মূল নীতির মধ্যে অন্যতম। ইসলামে শুধু ইবাদত নয়, বরং মানুষের সঙ্গে আচরণ, কথাবার্তা, এবং জীবনযাপনের প্রতি খেয়াল রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কয়েকটি মূলনীতি এবং ঘটনা তুলে ধরা হলো যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্যদের সঙ্গে সদাচারণে উদ্বুদ্ধ করবে।

**কৌতুক করার সীমা ও শালীনতা**

কৌতুক বা রসিকতা মানুষকে হাসানোর একটি মাধ্যম। তবে এরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

- যদি কৌতুক এমন হয় যা অন্যকে খুশি করে এবং কেউ বিরক্ত না হয়, তবে তা অনুমোদিত।
- কিন্তু যদি এটি কাউকে কষ্ট দেয়, বিব্রত করে বা অপমানিত বোধ করায়, তাহলে এটি বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

**আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:**
*"তোমরা কারও প্রতি বিদ্রূপ করো না। যে কাউকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।"*

**রিকশাওয়ালা বা দিনমজুরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন**

অনেকেই রিকশাচালক, দিনমজুর বা ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করে। এমনকি পিতার বয়সী রিকশাচালকদেরও "তুই" বলে সম্বোধন করতে দ্বিধাবোধ করে না। এটি ইসলামের শিক্ষা পরিপন্থী এবং মারাত্মক গুনাহ।

**আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:**
*"তোমরা ছোটদের প্রতি দয়া করো এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো।"* (আবু দাউদ, ৪৯৪৩)

আমাদের আচরণে সর্বদা অন্যদের প্রতি দয়া, সম্মান এবং ভালোবাসার পরিচয় থাকা উচিত।

**উদাহরণ: শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.**

শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. ছিলেন এক মহান আলেম। একবার দিল্লির শাহী জামে মসজিদে ওয়াজ করার সময় এক ব্যক্তি তাঁকে অপমান করে বলল, “আমি শুনেছি আপনি জারজ সন্তান।”

এ ধরনের কথা শুনে রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু শাহ ইসমাঈল রহ. সম্পূর্ণ শান্ত কণ্ঠে বললেন,

**“আপনি ভুল তথ্য পেয়েছেন। আমার আম্মার বিয়ের সাক্ষীরা এখনও জীবিত এবং এই মসজিদেই আছেন।”**

তিনি ধৈর্য ধরে সুন্দর ভাষায় উত্তর দিলেন, যা সত্যিকার অর্থে নবীদের উত্তরসূরীদের আদর্শ।

**উদাহরণ: ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.**

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. তাঁর শায়খ ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

একবার এক আত্মীয় গালি দিতে দিতে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. কোনো উত্তেজনা প্রকাশ না করে বললেন,

**“ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করে দিন। ইনশাআল্লাহ আমি আপনার ক্ষতি পুষিয়ে দেব।”**

তাঁর বিনম্র আচরণে ওই ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল।

**রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:**

*"যে তোমার প্রতি অবিচার করে, তাকে ক্ষমা করো। যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো।"* (সহীহ আত-তারগীব : ২৪৬৭)

**উদাহরণ: মাওলানা রফীউদ্দীন রহ.**

মাওলানা রফীউদ্দীন রহ. ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম। একবার গাভী চরানোর জন্য মাদরাসার মাঠে বেঁধে রাখেন।

স্থানীয় এক ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বলল,

**"মাদরাসার মাঠ কি গরু রাখার জায়গা?"**

মাওলানা রফীউদ্দীন রহ. অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন,

**"লোকটি ঠিকই বলেছে। মাদরাসার মাঠ আমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। এটি আল্লাহর সম্পত্তি।"**

তিনি লোকটির রাগ ভাঙানোর জন্য গাভীটিও তাকে দিয়ে দেন।

**কাউকে কষ্ট না দেওয়া: ইসলামের তৃতীয় মূলনীতি**

মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো,

**"কাউকে কষ্ট না দেওয়া।"**

- এটি অন্যায়ভাবে কাউকে মানসিক, শারীরিক, বা আর্থিক ক্ষতি না করার নির্দেশ দেয়।
- বাবা-মায়ের শাসন, শিক্ষকের শৃঙ্খলা, বা ন্যায়বিচার সংক্রান্ত শাস্তি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

**রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:**

*"মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।"* (সহীহ বুখারি : ১০)

**ট্রাফিক আইন মেনে চলা: একটি সামাজিক দায়িত্ব**

ট্রাফিক আইন অমান্য করলে জ্যাম, দুর্ঘটনা এবং মানুষের জান-মালের ক্ষতি হতে পারে।

**ইসলাম বলে:**

*"যে কাজ মানুষের কষ্টের কারণ হয়, তা থেকে বিরত থাকো।"*

সুতরাং আজ থেকে সিদ্ধান্ত নিন যে,

- সিগন্যাল মেনে চলবেন।
- নো পার্কিং এলাকায় গাড়ি পার্ক করবেন না।

**বাসা-বাড়িতে কষ্ট না দেওয়া**

পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং অন্য সদস্যদের প্রতি সদাচরণ করা জরুরি।

- যেমন, ব্যবহার করা তোয়ালে নির্দিষ্ট স্থানে না রেখে দিলে অন্যের অসুবিধা হয়।
- খাবারে লবণ বেশি বা কম হলে 'সবসময়' শব্দটি ব্যবহার করে কাউকে দোষারোপ করা উচিত নয়।

**রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:**

*"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে তার পরিবারের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।"* (তিরমিজি : ৩৮৯৫)

**আদব বা শিষ্টাচার কাকে বলে?**

ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলেছেন,

**"আদব হলো এমন কাজ করা যা দ্বারা অন্য কেউ কষ্ট না পায়। অন্যের কাছে বিরক্তিকর বা বিব্রতকর না হয়।"**

এ কথা থেকে বোঝা যায়,

- বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের ভালোবাসা আদবের মধ্যে পড়ে।
- কারও অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া বেআদবির পরিচায়ক।

ইসলাম শুধু ইবাদত নয়, বরং অন্যের সঙ্গে উত্তম আচরণ এবং সদাচরণের শিক্ষা দেয়।

- আমরা যদি প্রতিদিনের জীবনে কথাবার্তা, লেনদেন এবং চলাফেরায় এই মূলনীতিগুলো মেনে চলি, তাহলে আমাদের সমাজ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।
- কাউকে কষ্ট না দিয়ে, সদাচরণ করে এবং অন্যের প্রতি সহিষ্ণু হয়ে আমরা পার্থিব ও পরকালীন সফলতা অর্জন করতে পারি।

মানুষকে কষ্ট না দেওয়ার ফজিলত অত্যন্ত মূল্যবান এবং তা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার একটি অংশ। মানুষকে কষ্ট না দেওয়া শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি ইবাদতস্বরূপ। নিচে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হলো।

**১. মানুষের কষ্ট দূর করার ফজিলত**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

**"যে ব্যক্তি একজন মুমিনের দুনিয়ার কোনো কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন।"**

*(মুসলিম: ২৬৯৯)*

তাই মানুষের জীবন থেকে কষ্ট দূর করা এবং তাদের জন্য সহানুভূতিশীল হওয়া এমন একটি গুণ, যা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনে।

**২. জানের সাদকার প্রকৃত অর্থ**

অনেকে জানের বদলে জান সাদকা করার মান্নত করে থাকেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন, শুধু জান-প্রাণ রক্ষা করা নয়, কারো ক্ষতি থেকে বিরত থাকাও একটি সাদকার মতো।

**"মানুষকে তোমার অনিষ্টতা হতে মুক্ত রাখবে। এটা তোমার নিজের জন্য তোমার প্রাণের সাদকা।"**

*(বুখারী: ২৫১৮)*

এর মানে হলো, কারো ক্ষতি না করা এবং নিজের আচরণে অন্যের জন্য স্বস্তি বয়ে আনা, নিজের জন্য সাওয়াবের বড় কারণ হতে পারে।

**৩. প্রকৃত মুসলিমের পরিচয়**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

**"প্রকৃত মুসলিম সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ।"**

*(বুখারী: ১০)*

**জিহ্বা হাতের আগে উল্লেখ করার কারণ:**

১. **জিহ্বার প্রভাব বেশি:** হাতের চেয়ে জিহ্বার মাধ্যমে মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. **দূরত্বের বাধা নেই:** জিহ্বার মাধ্যমে হাজার মাইল দূরের মানুষকেও আঘাত করা সম্ভব।

৩. **শক্তি ছাড়াই আঘাত:** হাত দিয়ে আঘাত করতে শক্তি প্রয়োজন হয়, কিন্তু জিহ্বা দ্বারা সবাইকে আঘাত করা যায়।

৪. **ঝগড়ার মূল:** অধিকাংশ ঝগড়ার সূচনা হয় কটু কথা থেকে।

**৪. অন্যের সমালোচনা ও বদনাম থেকে বিরত থাকা**

ইয়াস ইবনু মুআবিয়া রহ. বলেন,

**"তোমার থেকে রোমান, সিন্ধু, তুর্কী, ভারতীয়রা নিরাপদে রইল, অথচ তোমার মুসলিম ভাই তোমার থেকে নিরাপদ নয়!"**

*(আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ১৩/১২১)*

**শিক্ষা:**

আপনার জিহ্বা বা হাত দিয়ে যদি আপনার মুসলিম ভাই-বোনের প্রতি অন্যায় করা হয়, তবে তা শুধু তাদেরই নয়, আপনার নিজের আত্মার ওপরও প্রভাব ফেলে।

**৫. সৃষ্টির সেবা ও আল্লাহর ভালোবাসা**

মাওলানা রুমী রহ. বলেছেন,

**"তাসবীহ, জায়নামায আর আলখেল্লা দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া যায় না, সৃষ্টির সেবা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না।"**

**উদাহরণ:**

ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা আছে, যেখানে মানুষের সেবার মাধ্যমে ঈমানদাররা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়েছেন।

- **যায়নুল আবিদীন আলী ইবনুল হুসাইন রহ.** রাতের আঁধারে গরিব-মিসকিনদের খাবার পৌঁছে দিতেন।
  *(তারীখু দিমাশক: ৪১/৩৮৩)*

**৬. সুন্দর আচরণের মাধ্যমে সাইলেন্ট দাওয়াত**

দাওয়াত শুধু মুখের কথায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং সুন্দর আচরণ এবং ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামের মর্মার্থ তুলে ধরা সম্ভব।

হাসান বসরী রহ. বলেছেন:

**"মানুষকে তোমার কর্ম দ্বারা উপদেশ দাও। কেবল তোমার কথার মাধ্যমে উপদেশ দিয়ো না।"**

*(আয-যুহ্দ: ২২২)*

**শিক্ষা:**

অমুসলিমরা মুসলিমদের আচরণ দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই মুসলিমদের উচিত, নিজ আচরণ দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ করা।

**৭. কারো কষ্ট দূর করার সওয়াব**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

**"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেবেন।"**

*(তিরমিযী: ১৯৩০)*

মানুষকে কষ্ট না দেওয়া এবং তাদের কষ্ট দূর করা স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করে।

মানুষকে কষ্ট না দেওয়া, সুন্দর ব্যবহার করা এবং তাদের কষ্ট লাঘব করা শুধু দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর নয়, আখিরাতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার জিহ্বা ও হাতকে মানুষের জন্য কল্যাণের উৎস বানান। আমীন।

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার এবং ইসলাম ধর্মের সহিষ্ণুতা, উদারতা এবং ন্যায্যতার উদাহরণ এর সারাংশ নিম্নরূপ:

**১. ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক অংশীদারি**

ইসলাম অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে এবং তাদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক, সৌজন্যবোধ ও অংশীদারিত্বের সুযোগ দিয়েছে। আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) জবাইকৃত পশুর গোশত মুসলমানদের জন্য হালাল এবং তাদের রমণীদের সাথে বিবাহ বৈধ।

**২. অমুসলিমদের সঙ্গে মেলামেশা**

- **উঠাবসা:** তাদের সাথে সাধারণভাবে মেলামেশা বৈধ, তবে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব সীমাবদ্ধ।
- **মসজিদে অবস্থান:** রাসূল (সা.) এর এক হাদীস অনুযায়ী, অমুসলিমদের কারণে জমিন নাপাক হয় না।

**৩. অমুসলিমদের প্রতি জুলুম নিষিদ্ধ**

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মজলুমের দোয়া কবুল হয়, যদিও সে কাফের হয়। এ থেকে বোঝা যায়, তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ ইসলাম নির্দেশ দেয়।

**৪. ভদ্র ও ধৈর্যশীল আচরণ**

মহানবী (সা.) অমুসলিমদের সাথে ধৈর্য ও ভদ্রতার পরিচয় দিতেন। এক হাদীসে যায়েদ ইবনে সাই'য়ার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) ধৈর্যশীলতা প্রদর্শন করেন।

**৫. অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া**

অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং তাদের সেবা করাও সুন্নাত। রাসূল (সা.) ইহুদি বালককে দেখতে যান এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান।

**৬. ক্ষমা প্রার্থনা ও দাওয়াত**

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর চাচা আবু তালিবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন, তবে আয়াত নাজিল হয় যে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাওয়া মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ।

**উপসংহার**

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং অমুসলিমদেরও মর্যাদা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করে। এটি প্রমাণিত হয় নবীজির জীবনের উদাহরণ ও ইসলামের বিভিন্ন নীতিমালা থেকে।আপনার দেওয়া তথ্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামের উদারতা, মানবিকতা ও সাম্যের নির্দেশনাগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে। নিম্নে এর প্রধান বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

**১. অমুসলিমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ন্যায্যতা রক্ষা:**

- মহানবী (সা.) এর একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তিনি একটি ইহুদির জানাজা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। কারণ তিনি বলেন, "এটাও তো একটি প্রাণ।" এটি মানব জীবনের মর্যাদা ও শ্রদ্ধার প্রতীক।
- অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। (বুখারী, হাদীস: ৩১৬৬)

**২. বন্দিদের প্রতি সদাচার:**

- বন্দিদের প্রতি সদাচার প্রদর্শনের বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা অত্যন্ত স্পষ্ট। বন্দিদের সঙ্গে ভালো আচরণের জন্য কুরআনে (সূরা ইনসান: ৮) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মহানবী (সা.) বন্দি ছুমামা ইবনে উছালকে দয়া প্রদর্শন করে মুক্তি দেন। তার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

**৩. যুদ্ধের সময় মানবতা ও উদারতা:**

- হুনাইনের যুদ্ধের পর বন্দিদের সঙ্গে উদার আচরণ এবং সম্পদ বণ্টন ইসলামের মহানুভবতা ও সদাচারের অনন্য দৃষ্টান্ত।
- যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন এবং তাদের আত্মমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মালিক বিন আউফকে পুনরায় তার গোত্রের নেতা নিযুক্ত করা হয়।

**৪. অমুসলিমদের জন্য দান-সদকা:**

- সাধারণ দান-সদকা মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়কে দেওয়া বৈধ। তবে যাকাত কেবল মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত।
- কোনো অমুসলিম প্রতিবেশী বিপদে পড়লে, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা ইসলামের মূলনীতি।

**৫. অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের অধিকার:**

- ইসলামে অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচার করাকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ইসলামের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদার আচরণের উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যায়, এটি কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং মানবতার প্রতি দয়া ও সমতার এক নিদর্শন। মুসলিমদের দায়িত্ব হলো ইসলামের এই উদার ও ন্যায়নিষ্ঠ নির্দেশনাগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং অমুসলিমদের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখা।

ইসলামের উদারতা, মানবিকতা ও সাম্যের নির্দেশনাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

**১. অমুসলিমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ন্যায্যতা রক্ষা:**

- মহানবী (সা.) এর একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তিনি একটি ইহুদির জানাজা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। কারণ তিনি বলেন, "এটাও তো একটি প্রাণ।" এটি মানব জীবনের মর্যাদা ও শ্রদ্ধার প্রতীক।
- অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। (বুখারী, হাদীস: ৩১৬৬)

**২. বন্দিদের প্রতি সদাচার:**

- বন্দিদের প্রতি সদাচার প্রদর্শনের বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা অত্যন্ত স্পষ্ট। বন্দিদের সঙ্গে ভালো আচরণের জন্য কুরআনে (সূরা ইনসান: ৮) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মহানবী (সা.) বন্দি ছুমামা ইবনে উছালকে দয়া প্রদর্শন করে মুক্তি দেন। তার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

**৩. যুদ্ধের সময় মানবতা ও উদারতা:**

- হুনাইনের যুদ্ধের পর বন্দিদের সঙ্গে উদার আচরণ এবং সম্পদ বণ্টন ইসলামের মহানুভবতা ও সদাচারের অনন্য দৃষ্টান্ত।
- যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন এবং তাদের আত্মমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মালিক বিন আউফকে পুনরায় তার গোত্রের নেতা নিযুক্ত করা হয়।

**৪. অমুসলিমদের জন্য দান-সদকা:**

- সাধারণ দান-সদকা মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়কে দেওয়া বৈধ। তবে যাকাত কেবল মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত।
- কোনো অমুসলিম প্রতিবেশী বিপদে পড়লে, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা ইসলামের মূলনীতি।

**৫. অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের অধিকার:**

- ইসলামে অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচার করাকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ইসলামের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদার আচরণের উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যায়, এটি কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং মানবতার প্রতি দয়া ও সমতার এক নিদর্শন। মুসলিমদের দায়িত্ব হলো ইসলামের এই উদার ও ন্যায়নিষ্ঠ নির্দেশনাগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং অমুসলিমদের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখা।

**উপসংহার:**

অমুসলিমদের অপতৎপরতা প্রতিরোধের জন্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্য অপরিহার্য। নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

**"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"**
***(সূরা আল-ইমরান: ১০৩)***

অমুসলিমদের অপতৎপরতার মুখে মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দ্বীন ইসলামের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ ও তার উপর দৃঢ় থাকা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন:

**"তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"**
*(সূরা আল-ইমরান, ৩:২০০)*

পৃথিবীতে বিভিন্ন মতবাদ ও কার্যকলাপের মুখে মুসলিমদের নিজেদের পরিচিতি, আচার-আচরণ এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সুরক্ষিত রাখতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

**"তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো মন্দ কাজ দেখে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। যদি তা না পারে, তাহলে জিহ্বা দিয়ে প্রতিরোধ করবে। আর যদি তা-ও না পারে, তাহলে অন্তরে ঘৃণা পোষণ করবে। এটি হলো ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।"**
*(সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ৪৯)*

সুতরাং, অমুসলিমদের অপতৎপরতার মোকাবিলায় আমাদের করণীয় হলো—

১. নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও প্রচার করা।

২. ন্যায় ও ইনসাফের পথে চলা।

৩. ধৈর্য ও সহমর্মিতার মাধ্যমে উত্তম আচরণ করা।
৪. ইসলামি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সুরক্ষায় একতাবদ্ধ থাকা।
আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঈমানকে দৃঢ় রাখুন এবং সকল প্রকার অপতৎপরতার মোকাবিলায় সফলতা দান করুন।


**তথ্যসূত্র:**
**লেখক: মাওলানা উমায়ের কোব্বাদী**
**বই : পাশ্চাত্য ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র**
**ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহ.)**
**বই: অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রসুল (সা:)**
**ড. রাগীব সারজানি**